ভূত বর্ত্তমান কাল

প্রথম খণ্ড।

সেই অতীত কালের সহিত বর্ত্তমান

সময়ের তুলনা

অর্থাৎ

সমাজের ধর্ম্মভাব, প্রচারিত ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, ব্যাধি, চিকিৎসা, সঙ্গীত-চর্চ্চা, শিক্ষা-প্রণালী, রচনা-প্রণালী, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার, বিবিধ পুস্তক এবং দেশীয় সংবাদ-পত্রিকা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা।

মহকুমা নওগাঁ বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব

হেড পণ্ডিত

শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষ প্রণীত।

কলিকাতা,

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২০

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

প্রিয়দর্শন পাঠক! প্রায পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক হইতে চলিল, বঙ্গের সুলেখক মহামতি রাজনারায়ণ বসু মহোদয় সেই সময়কে একাল, ও তাহার পূর্ব্বের সময়কে সেকাল, স্থির করিয়া সেই সুদীর্ঘ সময়ে দেশের যে সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা পূর্ব্বক "একাল ও সেকাল" নামে একখণ্ড পুস্তক প্রকাশ করেন। কিন্তু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে অতি সহজেই দেখা যায়, তাঁহার বর্ণিত সময়ের সহিত উপস্থিত সময়েব তুলনা করিলে পুনরায় দেশের প্রত্যেক বিষয়েরই অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তজ্জন্য আমি তাঁহার উল্লিখিত একালকে ভূত, ও উপস্থিত সময়কে বর্ত্তমান কাল উল্লেখে, এই ক্ষুদ্র পুস্তক খণ্ড "ভূত ও বর্ত্তমান কাল" নামে প্রকাশ করতঃ তাঁহার গম্যপথে পদার্পণ করিতেছি। "রাজেন্দ্র সঙ্গমে দাস যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

কিন্তু পাঠক! প্রোক্ত মহাত্মার ন্যায়, আমার চিন্তা ও কল্পনা-শক্তি এবং রচনা শক্তি প্রভৃতি কিছুই নাই, কেবল হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া, "পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘন" প্রয়াস সদৃশ, এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। সুতরাং উল্লিখিত মহাত্মা দেশের অসংখ্য ব্যক্তিগণ সমীপে একান্ত শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন, আমি কেবল দেশের ব্যক্তিগণের নিকটে যারপর নাই হাস্যাস্পদ হইতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু একটী প্রাচীন ঋষিবাক্য সমাজে

প্রচলিত আছে, "সদুদ্দেশ্যে দানং যদি ভস্মেহি মন্যে কাঞ্চনম্" সেই মহা বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমি এই দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে পাঠকগণ সমীপে বিনীত প্রার্থনা, ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানির প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা-কটাক্ষপাত করিলে, আমি সমুদায় শ্রম-সফল জ্ঞান করিব।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দেশের ধর্ম্মভাব, প্রচারিত ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, ব্যাধি, চিকিৎসা, সঙ্গীত-চর্চ্চা, শিক্ষা-প্রণালী, রচনা-প্রণালী, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার, বিবিধ পুস্তক, দেশীয় সংবাদ-পত্রিকা প্রভৃতি বিষয়ের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যথাসাধ্য সমালোচনা করা হইল।

ইহার মধ্যে সমুদায় ঘটনা সম্বন্ধে যে সকল সন উল্লেখ করা গেল, তাহা সমস্তই যে ঠিক হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। তবে নিশ্চয় রূপে প্রকাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। সময়াভাবে পুস্তকের প্রুফ সংশোধনে ত্রুটী হওয়ায় পুস্তক মধ্যে যে সমুদায় মুদ্রাঙ্কন ভুল রহিয়াছে, তাহার পৃথক 'শুদ্ধি পত্র' প্রকাশ করিলাম, এবং তজ্জন্য পাঠকগণ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণনাথ ঘোষ।

মহকুমা নওগাঁ, জিলা রাজসাহী।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
হোষ্টেলে	হোষ্টেল	৪	৯
শাস্ত্রানুমাদিত	শাস্ত্রানুমোদিত	৪	১৬
দুরবস্থা	দুরাবস্থা	৯	১৭
রাগের প্রকাশ	রোগের প্রকাশ	২২	৪
গত্যন্তর	গত্যান্তর	৩২	৬
কাশীশ্বর বকৃশী	কাশীশ্ব বকশীর	৪০	১
কাশীধাম	কাশীধামে	৪০	৯
বকমিঞা	বকুমিঞা	৪৩	১০
২।৩ জন	২।৩ ডজন	৪৮	১১
খুলন	খুলনা	৫৬	১২
সিন্নিবেশিত	সন্নিবেশিত	৫৯	৯
তপ্ত ঘর জলে	তপ্তজলে ঘর	৬১	২১
তাহার	তাঁহার	৬৩	১২
সমুদ্ভুব	সমুদ্ভব	৬৪	১
পরিত্যজ্য	পরিতেজ্য	৬৫	৮
কান্দিসে	কান্দ্‌লে	৬৫	১৪
বাতাস তরঙ্গে	সলিল তরঙ্গের	৭৫	১৩
ক্রন্দন করিতে	ক্রন্দন করিতে করিতে	৭৬	১৮

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ভোগ করিতেছে	ভোগ করিতেছি	৭৬	১৯
মাতঃ,	মাতঃ !	৭৭	৪
জঙ্গলা স্তর	জঙ্গলা স্থর	৭৭	১৪
ত্রা ত্রা	ঐ ঐ	৭৮	৪
নানা স্তরে ও জলে	নানা স্থরে ও জলে	৭৮	১৬, ১৭
ধরতে নারি হাত বাড়ালে	ধর্‌তে নারি দুটি হাত বাড়ালে	৭৯	২০
দেও বরে	দেও বলে	৭৯	২২
দোলায় উঠে	দোলাতে উঠে	৮০	৪
শালের জুরি চেইন ঘড়ি	শালের জুরি জুরিগাড়ী চেইন ঘড়ী	৮০	৮
রাম প্রসাদের মালশ	রামপ্রসাদের মালসী	৮৫	১
বলিয়	বলিয়া	১০১	১৪
স্থচিৎসা	শুচিকিৎসা	১২৪	৫
অধিকাংশই	অধিকাংশ	১২৮	১০
ডিএন বস্তু	ভিএন বস্তু	১৩৪	৮
এজলাস	এজলাসে	১৪৮	১৪
তাহার	তাঁহার	১৫১	১১
চিত্রবতী	বেত্রবতী	১৫১	১২
কালেবর	কলেবর	১৫৩	৫
করিয়াছিল	করিয়াছিলেন	১৫৫	১৯
তাহাদিগের	উঁহাদিগের	১৬০	১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ঈশ্বরয়ে	ঈশ্বরীরে	১৬১	৭
বহুল বহুল সুমধুর	বহুল সুমধুর	১৬২	৫
সমাজ	সমাজে	১৬৩	১৯
তপস্বী সাধু	তপস্বী মাধু	১৬৩	২০
প্রাবাহিত	প্রবাহিত	১৬৪	৫
খেলে	খেয়ে	১৬৫	১
পথে	নামে	১৬৬	১৮
যদি	যটি	১৬৭	৯
দেব মহাদেবের	দেবাদিদেব মহাদেবের	১৬৮	১৪
কানন প্রভৃতি	কানন প্রসূত	১৬৮	১৬
তাম রাশ	তামরস	১৭৭	১৬
অবিষ্কার করিয়া	আবিষ্কার করিয়া	১৭৭	১৮
কবিযা	করিয়া	১৭৮	৭
হয়ুমান	হনুমান	১৭৮	৭
এ মেশ	ক্রমশ	১৭৮	৮
কাব্য	বাক্য	১৮১	১৮
সাহসা	সহসা	১৮২	২২
পূস্তকে	পুস্তকে	১৮৮	১২
সামন্ত	সীমন্ত	১৯০	১০
পারর দিনে	পরের দিনে	২০০	১
নরনারী	নবনারী	২০২	১৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
গণিত গণিঙ্কাতসার	গণিতাঙ্ক ও গণিতসার	২০৫	৬
একতক্তা কাগজ নামক একখানি	'একতক্তা কাগজ একখানি	২১১	১১
গ্রন্থে সমুদায়	গ্রন্থ সমুদায়	২১৪	২২

পরম প্রজাবৎসল শ্রীলশ্রীযুক্ত মহামতি পঞ্চম জর্জ্জ মহাত্মার ভারতে আগমন।*

(১)

কি আনন্দ আজি ভারত-প্রাঙ্গণে।
আনন্দের উৎস উছলে নিয়ত।
আনন্দ-লহরী ধায় অবিরত।
উৎসাহ-সমীরে মিলিয়া সঘনে।

(২)

নব-অনুরাগে পূরব গগনে!
সুতরুণ ভানু গরবে প্রকাশে।
নবীন গৌরবে সুনীল আকাশে।
ছুটিছে উল্লাসে যত গ্রহগণে।

(৩)

শৈল কিরিটিনী ভারত-জননী।
অমর-বাঞ্ছিতা দেব-মনোলোভা
ধরিলা আ মরি! কি অপূর্ব্ব শোভা।
সুরাসুর নর মানস-মোহিনী।

---

* ভারতেশ্বরের ভারত আগমন সময়ে লিখিত হয়।

(৪)

শোভে দীপাবলি কাতারে কাতারে।
রম্ভা তরুশ্রেণী—প্রতি দ্বারে দ্বারে।
সহকার শাখা পূর্ণ কুম্ভ শিরে।
পুষ্পমাল্য তায় শোভে থরে থরে।

(৫)

বাজিছে নিয়ত বিবিধ বাজনা
নৃত্য গীত বাদ্য ভারত মাঝারে।
গর্জ্জিছে কামান সুগম্ভীর স্বরে।
সাজে বীর সাজে অগণিত সেনা।

(৬)

শ্বেত নীল পীত লোহিত বরণে।
অসংখ্য পতাকা সৌধশির পরে।
উড়িছে নিয়ত মৃদুল সমীরে।
স্বর্গ শোভা আজ ভারত ভবনে।

(৭)

এস ভারতের নরপতি সবে।
এস জয়পুর আইস ভূপাল।
আইস কাশ্মীর ভোটান নেপাল।
হও সমাগত রাজ মহোৎসবে।

(৮)

আইস ভারত নিবাসী সকলে।
ছোট বড় সবে প্রফুল্ল অন্তরে।

(৩)

এস ত্বরা করি 'ইন্দ্রপ্রস্থ পুরে'।
'রাজসূয়, যজ্ঞ হের কুতূহলে।

(৯)

স্বদেশে বিদেশে সুযশ যাঁহার।
জলে স্থলে যাঁর সর্ব্বত্র বিজয়।
যাঁর রাজ্যে সূর্য্য অস্ত নাহি হয়।
সবা প্রতি যাঁর সমান বিচার।

(১০)

যাঁহার পালনে সুখী প্রজাগণে।
যাঁর কীর্ত্তিরাশি ঘোষে ধরাতলে।
অসীম গৌরব এ মহীমণ্ডলে।
যাঁর যশোগীত গায় ত্রিভুবনে।

(১১)

সেই নরেশ্বর ভারত মাঝারে।
আসিবেন আজ মনের কৌতুকে।
শুভলগ্নে আজি বসিবেন সুখে।
ভারতের রাজ সিংহাসনোপরে।

(১২)

দুস্তার দুর্গম জলধি লঙ্ঘিয়ে।
এস নিরাপদে ঈশ্বর কৃপাতে।
এস এস দেব! এস এ ভারতে।
আছি সবে তব আসা-পথ চেয়ে।

(১৩)

এস দেবী মেরী ! ভারত-ঈশ্বরী।
রূপেতে কমলা গুণে সরস্বতী।
স্নেহের প্রতিমা ক্ষমার মূরতি।
স্বয়ং অন্নপূর্ণা রাজ-রাজেশ্বরী।

(১৪)

এস নরনাথ ! আজি শুভক্ষণে।
হেরি ও মূরতি নয়ন যুগলে।
জনম সফল করিব সকলে।
ব'স মন সুখে রাজ সিংহাসনে।

(১৫)

বসি যে আসনে পাণ্ডবশেখর।
ধার্ম্মিক আকবর বিক্রমকেশরী।
স্বর্গীয়া জননী ভারত ঈশ্বরী।
তব পিতৃ দেব ভারত-ঈশ্বর।

(১৬)

পালি সুশাসনে যত প্রজাগণে
সুযশ কেতন উড়ায়ে অম্বরে।
স্থাপি কীর্ত্তিস্তম্ভ ধরণী মাঝারে।
বিরাজেন এবে অমর ভবনে।

(১৭)

বসি সে আসনে, করি এ প্রার্থনা
আসন-গৌরব রাখিবে যতনে।

যেন নরপাল ! ভ্রমেও কখনে।
আসনে কলঙ্ক না হয় ঘোষণা।

(১৮)

প্রজা-বৎসলতা রাজার ভূষণ।
ন্যায় সত্য দয়া নিঃস্বার্থ চিন্তন।
প্রজা প্রতি ক্ষমা প্রজার রঞ্জন।
রাজধর্ম্ম দেব ! রাখিবে স্মরণ।

(১৯)

দরিদ্র ভারত হেরিয়া নয়নে।
নিরখি দুর্ব্বল ভারত সন্তানে।
করি এ মিনতি তোমার সদনে।
ঘৃণাভাব যেন নাহি হয় মনে।

(২০)

চির রত্ন-গর্ভা সুপবিত্র ধাম।
স্বর্ণ প্রসবিনী শান্তির আধার।
দিগন্ত ব্যাপিয়া সুযশ যাঁহার।
স্বর্গাদপি গরীয়সী যাঁর নাম।

(২১)

শোভে বিন্ধ্যাচল যাঁহার বক্ষেতে।
পবিত্র সলিলা বহে ভাগীরথী।
নর্ম্মদা যমুনা চির-বেগবতী।
দৃঢ় হিমাচল যাঁহার দ্বারেতে।

(২২)

জন্মি যে ভারতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
সুকবি বাল্মীকি কবি কালিদাস।
আর্য্যভট্ট আদি কবি চণ্ডীদাস।
জন্মিয়া ভারবী ভারত-ভূষণ।

(২৩)

জন্মি যে ভারতে রাম রঘুমণি।
রাজর্ষি জনক ভীষ্ম ভগীরথ।
তাপস-সত্তম গৌতম নারদ।
বিশ্বামিত্র আদি শুক মহাজ্ঞানী।

(২৪)

জন্মি যে ভারতে খনা লীলাবতী।
সাবিত্রী পদ্মিনী সীতা শকুন্তলা।
দময়ন্তী সতী অদিতি অপালা।
দেবহূতি গার্গী রোমশা ভারতী।

(২৫)

জন্মি যে ভারতে বুদ্ধ মহাজন।
ভকত প্রহ্লাদ চৈতন্য নানক।
গৌরব ছটায় উজলি ত্রিলোক।
অনন্ত সাগরে বিলীন এখন

(২৬)

তাঁহারি সন্তান মোরা সমুদয়।
এ মিনতি দেব! তোমার সদন।

ভুলনা কখন রাখিবে স্মরণ।
এ জাতি কখন ঘৃণিত নয়।

(২৭)

চির রাজভক্ত ভারত-তনয়।
নহে অবিশ্বাসী তাহারা কখন।
নরনাথ ! সদা রাখিবে স্মরণ।
এ জাতি কখন অকৃতজ্ঞ নয়।

(২৮)

নহে স্বার্থপর ভারত-সন্তান
রাজ-আজ্ঞা-কারী সবে নিশিদিনে।
রাজার আদেশে রাজার কল্যাণে
প্রস্তুত নিয়ত ত্যজিবারে প্রাণ।

(২৯)

করি এ প্রার্থনা তোমার সদন।
হে নরেন্দ্র ! এই ভারত-সন্তানে।
নিরখিবা দেব ! সস্নেহ নয়নে।
সন্তান বিশেষে করিবে পালন।

(৩০)

করি এ প্রার্থনা পরমেশ স্থানে।
সুদীর্ঘ জীবন করহ গ্রহণ।
শত বিঘ্ন বাধা করিয়া লঙ্ঘন।
বিরাজ হরিষে রাজ-সিংহাসনে।

(৩১)

ভারত-সন্তান মিলি সমুদয়।
গাও আজি সবে সুমধুর স্বরে।
গাও গাও সবে প্রফুল্ল অন্তরে।
জয় জয় জর্জ্জ রাজেন্দ্রের জয়।

(৩২)

গাইবে সে রব প্রতিধ্বনি চয়।
অনন্ত গগনে সুগভীর স্বরে।
ধ্বনিবে সে রব হিমাদ্রি শিখরে।
জয় জয় জর্জ্জ রাজেন্দ্রের জয়।

(৩৩)

জলধির গর্ভে তরঙ্গ নিচয়।
গাইবে সে রব ভীষণ কল্লোলে।
ধ্বনিবে সে রব সমীর হিল্লোলে।
জয় জয় জর্জ্জ রাজেন্দ্রের জয়।

(৩৪)

গাও গাও যত ভারত-তনয়।
প্রীতি প্রফুল্লিত হৃদয়ে সকলে।
গাও গাও সবে গাও কুতুহলে।
জয় জয় জর্জ্জ রাজেন্দ্রের জয়।
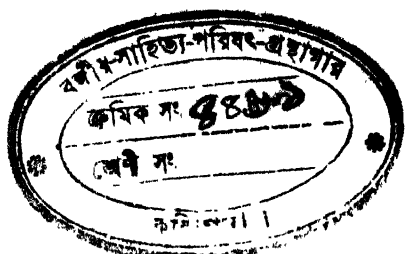
ভূত ও বর্ত্তমান কাল।

প্রথম অধ্যায়।

সমাজের ধর্ম্মভাব।

সেই অতীতকালে সমাজের ব্যক্তিগণের হৃদয়ে, যাদৃশ ধর্ম্ম-ভাব জাগরূক ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনেকাংশে শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন ভদ্রসমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মোদ্দেশে নানাবিধ স্তোত্র পাঠ করিয়া মনোমধ্যে অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা অনুভব করিতেন। প্রভাতকালে প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের নামোল্লেখ পূর্ব্বক অতি মৃদু মৃদুস্বরে বহুবিধ স্তোত্র পাঠ করায় প্রতি গৃহে একটী সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করা যাইত এবং সেই সমুদায় শান্তি-রসপূর্ণ স্তবরাজি শ্রবণ করিলে, হৃদয়ে এক অনুপম ভক্তিরসের সঞ্চার হইত। তাঁহারা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নয়নোন্মিলন করিয়া "দুর্গা দুর্গা" বলিয়াই নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিতেন। যথা—

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গা ক্ষরদ্বয়ম্। আপদস্তস্য ন শ্যন্তি তমঃসূর্য্যোদয়ে যথা॥ ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশীভূমিসুত বুধশ্চ গুরুশ্চ শুক্র শনি রাহু কেতু, কুর্ব্বন্তুসর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥"

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। পঞ্চঃ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশম্। পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ, পুণ্যশ্লোকাচবৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ। লোকেশ চৈতন্যময়াদি দেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণোভবদাজ্ঞয়ৈব। প্রাতঃ সমুত্থায় তবপ্রিয়ার্থং, সংসার-যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে। জানামিধর্ম্মং নচমেপ্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মিতথাকরোমি।"

এই সকল স্তব পাঠ করিয়া, তৎপর বাহিরে আসিয়া "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারি সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবা করম্" এই বলিয়া করযোড়ে সূর্য্যদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক হস্ত মুখ প্রক্ষালন করতঃ, কেহবা প্রাতঃস্নান, কেহবা রাত্রীবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপনে প্রবৃত্ত হইতেন। অতঃপর পুষ্প বিল্বপত্র ও তুলসী-চয়ন করিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে নদী বা পুষ্করিণীর ঘাটে, কোন কোন ব্যক্তিকে বাটীতে বসিয়া শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা ও শক্তিপূজা করিতে দেখা যাইত। তখন অধিকাংশ ব্যক্তিই পুষ্প-চয়ন, শিবলিঙ্গ-গঠন সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে আসক্ত ছিলেন।

প্রত্যেক গ্রামে গমন করিলে দৃষ্ট হইত যে, পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলে অসংখ্য পুষ্পরাজি অতি অপূর্ব্ব শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। এইরূপ পুষ্প-পরিশোভিত দিঘী পুষ্করিণী দর্শনে সেইগ্রামে ভদ্রলোকের অবস্থান স্থিরীকৃত হইত।

এইভাবে সন্ধ্যাপূজা সমাপন করতঃ তৎপর সকলে আপন আপন আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করিয়া মধ্যাহ্নকালে আহারান্তে কিঞ্চিৎকাল নিদ্রা যাইয়া, বৈকালে কেহ কেহ অক্ষক্রীড়া, কেহ কেহ মালাজপ, কেহবা শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত আদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া, হৃদয়ে অনুপম পবিত্রতা অনুভব করিতেন। পুনর্ব্বার সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা ও বহুবিধ স্তব পাঠকরতঃ ভোজনান্তে নিদ্রা যাইতেন।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই প্রাচীন রীতি নীতি বিদূরিত হইয়াছে। অধিকাংশ ব্যক্তিরই হৃদয়ে আর সেরূপ ধর্ম্মভাব দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে নব্য-সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান সময়ে "প্রভাতে যঃস্মরে নিত্যং" প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ, প্রাতঃস্নান রাত্রীবাস কাপড় পরিত্যাগ, পুষ্প-চয়ন, প্রাতঃসন্ধ্যা, শিবপূজা, মালা জপ, পুরাণাদি পাঠ করিতে দেখা যায় না। অনেকেই প্রাতেঃ ও বৈকালে খোষগল্প ও ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পাঠ করাই জীবনের কর্ত্তব্যকার্য্য মনে করেন। ধর্ম্মোদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্য করিতে দৃষ্ট হয় না। যদিচ কোন কোন ব্যক্তিকে প্রত্যহ সন্ধ্যাপূজা করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

তখন রাজকর্ম্মচারিগণ বিচারালয় হইতে, বাসায় আসিয়া, পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ, ধৌত বস্ত্র পরিধান ও হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক গঙ্গোদক অভাবে তুলসীর জল স্পর্শ করিয়া, তৎপর জলপান করিতেন। কিন্তু এক্ষণে ধৌত বস্ত্র পরিধান,

গঙ্গোদক, তুলসীর জল স্পর্শ করা দূরে থাকুক, অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ, কাছাড়ীতেই জল যোগ করিয়া থাকেন।

সে সময় হিন্দু সন্তানগণ নৌকায় গমনকালীন প্রাণান্তেও মুসলমানের নৌকায় সন্ধ্যা পূজা ও আহারাদি করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই রেলগাড়ীতে ও ষ্টীমারে অনায়াসেই আহার করিতেছেন, হোষ্টেলে আহার করা তখন অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। বিশেষতঃ তখন দেশে হোষ্টেলও সংস্থাপিত ছিলনা। কেবল কলিকাতা মহানগরীতে বিখ্যাত "উইলসেনের হোষ্টলে" প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখনং দেশে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত ছিল, "তিন সেনে জাতি নাশ করিল, যথা বল্লালসেন, উইলসেন ও ষ্টেশেন"; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা, এমন কি, অধিকাংশ রেল ষ্টেশেনে হোষ্টেল স্থাপিত রহিয়াছে। এবং ছত্রিশ জাতি এক সঙ্গে আহার করিতেছেন।

তখন সমাজের হিন্দুগণের ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ আস্থা থাকাতে,সকলেই হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য সকল আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। যথা পূর্ব্ব পুরুষের, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, সন্ধ্যা পূজা সমাপন, গৃহে শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, শিবপূজা, মঙ্গল কামনায় শালগ্রামকে তুলসী দান, দুর্গোৎসব, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, রাসযাত্রা প্রভৃতি দেবার্চ্চন, পুষ্করণী খনন ও প্রতিষ্ঠা, গৃহ প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষবিবাহ, তুলসী সেবা, হরিনামের মালা জপ, পুরাণ পাঠ ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান, জন্মাষ্টমি, শিবচতুর্দ্দশী ও সোমবারের উপ-

বাস ইত্যাদি, এমন কি, হিন্দুরমণীগণ ও সাবিত্রী, সর্ব্বজয়া, তাল নবমী, দুর্গাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। বালিকারা বাল্যকাল হইতেই হেঁচড়া পূজা, তারা ব্রত, পুণ্য পুখুরের ব্রত প্রভৃতি, শাস্ত্রোক্ত ব্রত গুলি সম্পন্ন করায় হৃদয়ের অকাট্য বিশ্বাসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমাজের ব্যক্তিগণের আর তাদৃশ শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকাতে উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত কার্য্য গুলি দেশ হইতে প্রায় তিরোহিত হইয়াছে।

সে কালে সেই আর্য্য ঋষিগণের প্রচারিত নিয়মগুলি সকলেই অতিশ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালন করিতেন। অর্থাৎ নবমীতে লাউ, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, প্রতিপদে কুশাণ্ড, অষ্টমিতে নারিকেল প্রভৃতি ভক্ষণ করিতেন না। সকলেই প্রাতেঃ পঞ্জিকা দেখিয়া বলিতেন, অগ্য ত্রয়োদশী, অগ্য নবমী, গৃহের রমণীগণেরও শাস্ত্র জানা ছিল, তাঁহারা যখন শুনিলেন, অগ্য ত্রয়োদশী, অমনি ব্যঞ্জনে বার্ত্তাকু দেওয়া বন্ধ করিলেন। তখন কেবল যে ভদ্রলোকেই শাস্ত্রোক্ত নিয়মগুলি পালন করিতেন, এমত নহে। অনেক হীনবংশোদ্ভব-ব্যক্তিদিগেরও শাস্ত্রীয়-বিধানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। একদা একটী নমঃশূদ্র নিমন্ত্রণের ভোজন সময়ে প্রতিপদে ব্যঞ্জনে কুষ্মাণ্ড দৃষ্টি করিয়া আর আহার করিল না। একদিন একটী ব্রাহ্মণ একটী হীনজাতির বাটীতে কোন কার্য্যানুরোধে উপস্থিত হইয়াছেন। গৃহস্থের একটী অল্পবয়স্ক বালক কতকগুলি মৎস্য ধরিয়া

আনিয়াছিল। তৎদৃষ্টে গৃহকর্ত্তা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, "অন্ত রবিবার, আজ কাক, চিলে মাছ খায় না, তুই বাটীতে মাছ আনিয়াছিস" এই বলিয়া সমুদায় মাছগুলি ফেলিয়া দিল। এক্ষণে কি আর সমাজে সেইরূপ, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকুর, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ডের ও রবিবারে মৎস্যের বিচার দৃষ্টিগোচর হয়?

তখন, তীর্থ-পর্য্যটন জীবনের একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিতেন। তজ্জন্য সকলকেই সেই দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল তীর্থপথ লঙ্ঘন করিয়াও, কাশী, গয়া, শ্রীবৃন্দাবন ও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে দেখা যাইত। উড়িষ্যার পথ গমন এরূপ ভয়ঙ্কর স্থান ছিল যে, তখন একটী জনপ্রবাদ শুনা যাইত "জগন্নাথ যেন মনে হয়, কিন্তু পথ যেন মনে হয় না।"

এক্ষণে রেলগাড়ী, ষ্টিমার প্রভৃতির সাহায্যে গম্যপথ যারপর নাই সুগম হওয়াতেও এক্ষণে অনেকেরই ধর্ম্মোদ্দেশে তীর্থস্থানে গমনে প্রবৃত্তি বা বিশ্বাস দেখা যায় না।

সেই সময়ে কোন ব্যক্তি প্রাণান্তেও রাজদ্বারে সাক্ষ্য প্রদান করিতেন না। কারণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে "হলফ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে পূর্ব্বপুরুষ নরকগামী হয়।" এই বিশ্বাসে কি জানি যদি কোনরূপ মিথ্যা কথা বলিতে হয়, তজ্জন্য কখনও কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে দেখা যাইত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস না থাকাতে অনেকেই প্রতিহিংসা পরিশোধ কিম্বা স্বার্থসিদ্ধি অথবা ব্যক্তিবিশেষের সন্তোষার্থে অনায়াসে হলফ পড়িয়া মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

তখন প্রজা ও ভূম্যধিকারী এবং খাতক ও মহাজনের মধ্যে প্রায়ই মামলা মোকর্দ্দমা প্রচলিত ছিল না। কারণ প্রজা ও খাতকগণের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, "রাজকর ও মহাজনের দেনা পরিশোধ না করিলে অন্ন যোটে না এবং ঋণদায়ে পরিণামে নরকভোগ করিতে হয়", এই বিশ্বাসে সকলেই রাজকর ও মহাজনের দেনা পরিশোধ জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। যদি কখনও কোন প্রজা বা খাতকের নামে নালিশ হইত, তাহা হইলে দেনদারগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাজন বা মনিবের সঙ্গে নিষ্পত্তি করিয়া দেনা পরিশোধ করিতেন। কোন ব্যক্তিই উচিত দেনা অস্বীকার করিতেন না। এজন্য তখন পাট্টা কবুলিয়ত ও খতপত্রের ততদূর আঁটাআঁটী ছিল না। কিন্তু এক্ষণে শাস্ত্রে তাদৃশ বিশ্বাস না থাকায় রেজিষ্টারিকৃত কবুলিয়ত ও খত প্রদান করিয়াও অনেকেই স্বীয়দেনা হইতে নিষ্কৃতিলাভের প্রত্যাশায় নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন।

সে সময়ে কোন স্থানে গমন করিতে হইলে সকলেই মাসদগ্ধ, ত্রয়োস্পর্শ, দিক্‌দোষ, পক্ষান্ত দোষ, নক্ষত্রামৃত, তিথ্যামৃতযোগ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাত্রা করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তদ্বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে অনেক ব্যক্তিকেই উদাসীন দেখা যায়।

প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, মৃত্যুকালীন যে সে ভাবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেও স্বর্গলাভ হয়, যথা—

"অজামিল নামেতে দ্বিজ বহুত পাতকী ছিল, পুত্রের নামে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে গমন।"

সেই শাস্ত্রোক্ত বাক্যে অকাট্য বিশ্বাস থাকাতে তখন সমুদায় ব্যক্তি দেব দেবীর নামে স্বীয় পুত্র-কন্যার নাম রাখিতেন। পুত্রের নাম যথা হরিনারায়ণ, রামনারায়ণ, রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি কন্যার নাম যথা দুর্গাসুন্দরী, উমাসুন্দরী, কালীতারা, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি কিন্তু বর্ত্তমানসময়ে নব্যসম্প্রদায় মধ্যে সেই শাস্ত্রীয় বাক্যে বিশ্বাসনা থাকাতে এক্ষণে স্বীয়পুত্র কন্যার নাম দেবদেবীর নামে না রাখিয়া অতিশ্রুতিমধুর ও অভিধান-সম্মত নাম রাখা হয়। পুত্রের নাম যথা বিনয়ভূষণ, সুবোধকুমার, প্রফুল্লকুমার ইত্যাদি, কন্যার নাম যথা স্নেহলতা, সুবাসিনী, সুহাসিনী, কিরণবালা, প্রভাময়ী, ইত্যাদি।

তখন সকল লোকেরই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করাই জীবনের প্রকৃত কার্য্য। এজন্য তাঁহারা সেই প্রাচীন বাক্য অর্থাৎ "ঔষধে চিন্তয়ে বিষ্ণু ভোজনেচ জনার্দ্দন" এই শ্লোকানুসারে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করিতেন। তৎভিন্ন অনেকেই টিয়ে, ময়না প্রভৃতি পক্ষীশাবক অতিযত্নের সহিত প্রতিপালন করিয়া, সকল সময়েই বিশেষতঃ প্রত্যূসে ও সায়ংকালে "কালী কল্পতরু শিবজগতগুরু শিবঃ শিবঃ রাম রাম" প্রভৃতি শ্লোক অতি ভক্তির সহিত পক্ষীশাবককে অভ্যাস করাইতেন। তাহার উদ্দেশ্য, এই উপলক্ষে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে সে বিশ্বাস দূরীকৃত হওয়ায় কাহাকে আর পক্ষীশাবক প্রতিপালন এবং তদুপলক্ষে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করিতে দেখা যায় না।

বিস্তৃত বিবরণ দেখিতেছি, তখন এই আখ্যানকে একটী কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের বিশ্বাস যে এই হরিশ্চন্দ্র-সংযুক্ত শৌনঃশেপ আখ্যান একটী প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। আমরা যেমন আমাদের পিতামহ ও প্রপিতামহগণসম্বন্ধীয় জ্ঞাত কথা আখ্যানচ্ছলে উল্লেখ করিতে পারি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্রকথা পড়িলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে ঐতরেয় ঋষি ঋগ্বেদের শৌনঃশেপ মন্ত্রসমূহের উদ্ভব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞাত কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনা-জ্ঞাপক অতীতকাল (লিট্) ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ঋগ্বেদীয় মন্ত্রসমূহে বর্ত্তমান ভাবই সুব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয় যে ঋগ্বেদ এবং তাহার ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের মধ্যে ন্যূনাধিক শতবর্ষ-কাল ব্যবধান পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রণয়নের সময়ে ঋষিরা ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বলিত নামধাম ভুলিতে পারেন নাই, ঠিক ঠিক রাখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

ঋগ্বেদের শৌনঃশেপ ঋক্‌সমূহে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শৌনঃশেপ আখ্যানে এমন এক সরলতার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে যে, সেইগুলি একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ঋগ্বেদোক্ত উক্ত পাশসমূহও কল্পিত পাশ নহে এবং ব্রাহ্মণোক্ত আখ্যান কল্পিত উপাখ্যান নহে; উভয়েরই ভাষা, লিখিবার রীতি অত্যন্ত প্রত্যক্ষব্যঞ্জক (ইংরাজিতে যাহাকে realistic বা dramatic বলা যাইতে পারে)। ব্রাহ্মণোক্ত আখ্যানে কেবল বরুণ রাজার (অথবা ভগবানের) প্রত্যক্ষ আবির্ভাবরূপ কবিত্বের একটু আবরণ রহিয়াছে। *

---

* ঋগ্বেদোক্ত শৌনঃশেপ মন্ত্রগুলি যে হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক শুনঃশেপের বন্ধন

কথা হইতে ঐতি-হাসিক তথ্য সংগ্রহ।

এখন আমরা ঐতরেয়োক্ত হরিশ্চন্দ্রকথা অথবা শৌনঃশেপ বৈদিক হরিশ্চন্দ্র-আখ্যান আলোচনা করিয়া কি ঐতিহাসিক সত্যরত্ন সকল সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাই দেখা যাউক। আমাদের বোধ হয় যে, এই আখ্যানের মূল সূত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ সূত্রেই এই আখ্যানোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই আখ্যান উক্ত হইবার অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে, বিশ্বামিত্র রাজর্ষিত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের উদ্যোগ করিতেছিলেন। † এই আখ্যানে দেখিতে পাই যে, বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের

বিষয়েই লিখিত হইয়াছে, এ বিষয়ে একেবারে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারি না। তাহার কারণ, প্রথমত ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রসমূহে হরিশ্চন্দ্রের কোন প্রকার নামই দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা দেখিতে পাই যে শুনঃশেপ বন্ধন মুক্ত হইবার পর অঞ্জঃসব নামক আসব আবিষ্কার করিলেন; কিন্তু অঞ্জঃসব সম্বন্ধীয় ঋক্‌সমূহ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২৮ তম সূক্তে দেখি এবং শুনঃশেপের বন্ধনমুক্তির ঋক্‌সমূহ ৩০তম সূক্তের শেষে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ অনেক গুলি শৌনঃশেপ মন্ত্রেই পাপ হইতে মুক্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমাদেরও মনে সন্দেহ হয় যে, ইতিপূর্ব্বে যে ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে "ত্রিষু দ্রুপদেষু" শব্দের অর্থে সত্যসত্যই তিনটী কাষ্ঠদণ্ড বুঝাইবে অথবা রূপকচ্ছলে কায়মনোবাক্যের ত্রিদণ্ড বুঝাইবে? আমরা অবশ্য নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি না যে কায়মনোবাক্যের ত্রিদণ্ড বুঝাইবেই—আমরা কেবল একটী ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। কোন্ অর্থ নিশ্চয় বুঝাইতে পারে, সে বিষয়ে কোন বেদজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনা পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইলে আমরা উপকৃত হইব। আমরা আপাততঃ মহামতি সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের অনুসরণ করিয়া ধরিয়া লইতেছি এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে ঋগ্বেদোক্ত ঐ সকল মন্ত্র হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক শুনঃশেপের বন্ধনবিষয়কই বটে।

† অধ্যাপক মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন যে এই সময়ে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব আক

অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে প্রধান হোতৃপদে অভিষিক্ত আছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ব্রহ্মাপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই; আবার শুনঃশেপ তাঁহাকে দুই এক স্থলে 'রাজপুত্র', 'ভরতঋষভ' প্রভৃতি ক্ষত্রিয়োচিত বাক্যেও সম্বোধন করিতেছেন। ইহাতেই বুঝিতেছি যে, তখনও বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়কুলোৎপত্তি ব্রাহ্মণেরা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই; তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে দুএকটী ভিন্ন ব্রাহ্মণোচিত সকল কর্ম্মে অধিকার প্রদান করিলেও তখন পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়োচিত সম্বোধনে আহ্বান করা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই, এবং বিশ্বামিত্র সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য পূর্ব্বক সমগ্র আখ্যানটী পড়িয়া আমাদের প্রতীতি হয় যে, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রের প্রতি ক্ষত্রিয়সন্তান হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের চেষ্টার জন্য তখনও অত্যন্ত জাতক্রোধ ছিলেন—অজীগর্ত্ত যখন তাঁহার পুত্র প্রতিপ্রদানের প্রার্থনা করেন সেই সময়ে বিশ্বামিত্র তাহাতে বাধা দেওয়াতে ঐতরেয় ঋষি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যেন অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা কিছু বিরক্ত হইয়া, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রতাপে ভীত হইয়া, গম্ভীর-নীরব ছিলেন। ‡

ক্ষত্রিয়দিগের উপর ব্রাহ্মণদিগের এই বিদ্বেষভাব সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই, ইত্যবসরে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বিশেষ প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, হরিশ্চন্দ্র যখন শুনঃশেপকে যজ্ঞীয় পশুরূপে

করিয়াছিলেন। তাহা যে ঠিক নহে, তাহা বাল্মীকিপ্রোক্ত বিশ্বামিত্রের চরিতাখ্যানেই (রামায়ণ আদি, ৫৭।৫৮ সর্গ দেখ) দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ মনুসংহিতায় অজীগর্ত্তের নির্দ্দোষিতা উল্লেখ করিয়া যে শ্লোক আছে, তাহাতেও বোধ হয় যে বিশ্বামিত্রের এই কার্য্যে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট ছিলেন

প্রাপ্ত হইলেন, তখন বরুণরাজার (অর্থাৎ ভগবানের) নিকটে রাজসূয় যজ্ঞ করিবারই "আদেশ" প্রাপ্ত হইলেন; অর্থাৎ এই সময়ে তাঁহার রাজসূয় অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প স্থির হইল। রাজসূয় যজ্ঞ অতি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইত; ইহার আয়োজন অতি বিপুলরূপে সংগৃহীত হইত; এবং এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারিলে অনুষ্ঠাতা ইন্দ্রতুল্য মর্য্যাদা এবং অনুষ্ঠানকালে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং এরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠানের সংকল্প একদিনে যে স্থির হয় নাই, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এবং যে অনুষ্ঠানে ক্ষত্রিয়গণ ক্ষণকালের জন্যও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহার জন্য অধিকতর উত্তেজিত হইতে পারিতেন, হরিশ্চন্দ্র সেই অনুষ্ঠান করিতে যাওয়াতে নারদপ্রমুখ ব্রাহ্মণ ঋষিগণ যে তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে পারেন, তাহা অনুমান করিবার জন্য বোধ হয় আমাদিগকে অতিরিক্ত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। আমাদের বিশ্বাস যে, হরিশ্চন্দ্র রোহিতের জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হই-তেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করিতেছিলেন এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা কিছু বিরক্ত বা আশঙ্কিত হইয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে অংশে (৭ম, ১৯) রাজসূয় যজ্ঞের উৎ-পত্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই অংশ দেখিলেই আমাদের এইরূপ বিশ্বাসের কারণ বুঝা যাইবে। সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, এই রাজসূয় যজ্ঞ লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পরের মধ্যে মহান্ বিরোধ ঘটিয়াছিল। ক্ষত্রিয়েরা স্থূল ধনুর্বাণ প্রভৃতি

না—বিশ্বামিত্র অজীগর্ত্তকে দোষী বলায় যেন অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র খুব সম্ভবতঃ আমরা মনুসংহিতায় উক্ত শ্লোকে প্রাপ্ত হই।

অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা জয়লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণদিগেরই জয়লাভ হইল। কিন্তু তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগকে যজ্ঞফল হইতে একেবারে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না। স্থির হইল যে, ক্ষত্রিয়েরা নিজে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের দ্বারা করাইতে পারিবেন। কেবল তাহাই নহে, যখন ক্ষত্রিয় রাজা যজ্ঞের নিমিত্ত দীক্ষিত হইবেন, তখন তাঁহাকে সম্মত হইতে হইবে যে, কোনরূপে তিনি ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মানমর্য্যাদা, ধন, আয়ু প্রভৃতি সর্ব্বস্ব, এমন কি সন্তানসন্ততি পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে পারিবেন। ইহার অধিক আরও স্থির হইল যে, ক্ষত্রিয় রাজন্য যতক্ষণ অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিবেন,ততক্ষণ মাত্র তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে, কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হইলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণের নির্মোক ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব পুনর্গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিবরণ দেখিয়া, বিশ্বামিত্রের রাজর্ষিত্ব লাভের কিছু পরেই হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা করায়, বিশেষতঃ যে অনুষ্ঠানে সর্ব্বপ্রধান হোতৃপদ তদানীন্তন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকেই দিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা ছিল তাহাতে যে, নারদপ্রমুখ ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের বিরক্তি ও ক্রোধ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কিছুমাত্র অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

ইহার উপর বাল্মীকিপ্রোক্ত বিশ্বামিত্র-সম্পর্কীয় পূর্ব্ব ঘটনাগুলি আমাদের এই প্রকার প্রতীতির সপক্ষে গুরুতর সাক্ষ্যদান করিবে। হরিশ্চন্দ্রপিতা ত্রিশঙ্কুর সমকালে বিশ্বামিত্র কোন প্রদেশের প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অবশেষে

বসিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মবিদ্যা যে সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা, বসিষ্ঠ তাহা বিশ্বামিত্রকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তখন বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিবার অভিলাষ জন্মিল। তিনি বসিষ্ঠের নিকটে রাশি রাশি ধনরত্নের বিনিময়ে সেই ব্রহ্মবিদ্যা ক্রয় করিবার বাসনা জানাইলেন। বসিষ্ঠ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে তিনি বলপূর্ব্বক তাহা অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। রাজসূয় যজ্ঞ লইয়া একবার ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; আবার এই সূত্রে বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ পুনর্জাগ্রত হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মণেরা শক, যবন, হূন প্রভৃতি বর্ব্বরজাতিদিগের সহায়তায় বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করিতে পারিল। অবশেষে তিনি তপস্যা বা কঠোর অধ্যবসায়ের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রাহ্মণত্ব লাভের যত্ন করিয়া সর্ব্বপ্রথম রাজর্ষিত্ব লাভ করিলেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় তপস্যার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে হরিশ্চন্দ্রপিতা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গলাভের ইচ্ছাতে কুলপুরোহিত বসিষ্ঠের নিকট যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। বোধ হয়, বিশ্বামিত্রের কারণে ক্ষত্রিয়দিগের উপর ঘোরতর ক্রোধ সঞ্জাত হওয়ায় বসিষ্ঠ "তাহা হইবার নহে" বলিয়া ত্রিশঙ্কুকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ত্রিশঙ্কু বসিষ্ঠের নিকটে প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে তাঁহার পুত্রগণের নিকটে সেই প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে তাঁহারা ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল হইবার অভিশাপ প্রদান করিলেন অথবা তাঁহাকে 'একঘরে' করিলেন। অগত্যা ত্রিশঙ্কু রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকটে গিয়া সেই প্রস্তাব করিলেন এবং বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রতি কৃপাপর-

বশ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। বসিষ্ঠপুত্রেরা এই যজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না আসাতে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে মুষ্টিক (ডোম) হইবার অভিশাপ দিয়া 'একঘরে' করিয়া ফেলিলেন। এইস্থলে দেখি যে বিশ্বামিত্রের হোতৃত্ব করিবার অধিকার হয় নাই—তিনি এই যজ্ঞে অধ্বর্য্যুর নিম্নপদে বরিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেবতাদিগের সাহায্যে এই যজ্ঞের ইষ্টফল বিষয়ে বিশ্বামিত্রকে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে দেন নাই। এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল, ইতাবসরে ত্রিশঙ্কু পরলোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব লাভ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র কোন শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিবেন, আর বাস্তবিকও তিনি শ্রেষ্ঠ হোতৃপদ লাভ করিয়াছিলেন; এই অবস্থায় ক্ষত্রিয়দিগের উপর ব্রাহ্মণদিগের ক্রোধ ও বিরক্তি পুনঃ সন্দীপিত হওয়াই সম্ভব।

যাই হৌক্, আমাদের অনুমান হয় যে, হরিশ্চন্দ্র নারদ প্রভৃতির নিকটে রাজসূয় অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প প্রকাশ করাতে তাঁহারা তাঁহাকে যজ্ঞক্ষেত্রে তাঁহার নবজাত পুত্র বলিদান করিতে পরামর্শ দিয়া কোন প্রকারে সম্মত করাইতে পারিয়াছিলেন; অথবা এই যজ্ঞ করিলে তাঁহার নবজাত পুত্রকে হত্যা করিয়া বংশলোপ করিবেন, হরিশ্চন্দ্রকে ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহাও অনুমান হয়। হরিশ্চন্দ্র স্বাভাবিক পুত্রবাৎসল্য বশত রাজসূয় স্থগিত রাখিয়া রোহিতকে রক্ষা করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে, যখন তিনি বরুণরাজার (অর্থাৎ বরুণরাজার হইয়া নারদপ্রমুখ যে সকল ব্রাহ্মণ রোহিতের বলিদানের পরামর্শ

দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের) অনুরোধ এড়াইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না; অথবা যখন তিনি দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া তাঁহার যৌবনারূঢ় পুত্রবধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন, তখন তিনি রোহিতকে ডাকিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহাকে যজ্ঞক্ষেত্রের পশু হইয়া নিহত হইতে হইবে; এই সূত্রেই পূর্ব্বাহ্নেই হরিশ্চন্দ্র যে স্বীয় পুত্রকে পলায়নের পরামর্শ দেন নাই, একথা কে বলিতে পারে? আর, রোহিতেরও তখন "বর্ম্মধারণের" উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, সুতরাং তিনিই বা সে প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কেন? তিনি এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদিগকে প্রবল দেখিয়া, ধনুর্ব্বাণমাত্র সহায় করিয়া অরণ্যে পলায়ন করিলেন। এই বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের নিশ্চয় সহায়তা ছিল, অন্যথা তাঁহার প্রতি রোহিতের ভক্তি থাকিতে পারিত না—শুনঃশেপেই আমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। কিন্তু রোহিতের পিতৃভক্তি অব্যাহত ছিল, পিতার উদরী হওয়াতে তাঁহার গৃহাগমনচেষ্টাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

আখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে, হরিশ্চন্দ্রের উদরী হওয়াতে রোহিত তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া অরণ্য পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার উপদেশ অনুসারে রোহিত পঞ্চ সুদীর্ঘ বৎসর অরণ্যেই যাপন করিলেন। বোধ হয়, কতকগুলি ব্রাহ্মণ রোহিতের বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা হয়ত গ্রামের সংবাদ আনিয়া রোহিতকে প্রদান করিতেন। অনুমান হয় যে, যতদিন ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন সেই দলস্থ ব্রাহ্মণেরা রোহিতকে গ্রামে যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন—বোধ

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, "নরাগজাবিশাশ" সেই শ্লোক আর সমাজে প্রচলিত নাই। এবং একশ তের উর্দ্ধ বা ৯০।৯৫ বৎসর কোন ব্যক্তিকে জীবিত থাকা প্রায় দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে ৫০ বৎসরই মানবজীবনের শেষ সীমা বলিতে হয়। এবং ২০ বৎসরই যৌবনাবস্থা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তথন ৪০ বৎসরে সকলেরই চক্ষে একটা ঝাপ্‌সা ধরিত। জিজ্ঞাসিলে বলিতেন আমার 'চাল্‌শে" ধরেছে। এক্ষণে সে ঝাপ্‌সাটা ৩০ বৎসর বয়সেই উপস্থিত হয়। এবং জিজ্ঞাসিলে বলেন আমার (ত্রিশে) ধরেছে।

কিন্তু তথন সমাজে বালিকা বিবাহের বিশেষ প্রচলন ছিল। সকলেই প্রাচীন সংহিতার মতানুসারে কন্যা দান করিতেন। অর্থাৎ সপ্তমবর্ষে গৌরী দানের, অষ্টমবর্ষে রোহিণী, নবমবর্ষে পৃথিবী ও দশম বর্ষে কন্যাদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কন্যার বয়স ইহার উর্দ্ধ হইলে পূর্ব্ব পুরুষ নরকগামী হন। এই শাস্ত্রীয় মতের উপর বিশ্বাস করিয়া সকলেই অল্প বয়সে কন্যা দান করিতেন। কিন্তু এক্ষণ সমাজের লোকে আর বালিকা বিবাহের পক্ষপাতী নহেন। এবং কোন ব্যক্তিই আর গৌরীদানের, পৃথিবীদানের ফল প্রত্যাশা করেন না।

তথন সমাজের ব্যক্তিগণ যেরূপ দীর্ঘ জীবন ভোগ করিয়াছেন, সেইরূপ সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিলেন। চিররোগী, ক্ষীণকায় এবং দুর্ব্বল লোক প্রায় দেখা যাইত না। কোন কোন ব্যক্তি এতাদৃশ অসাধারণ বলশালী ছিলেন যে, তাঁহাদের বল

বীর্য্যের কথা শুনিলে হয়ত পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। কিম্বা আমাদের কথা অবিশ্বাসও করিতে পারেন। জিলা যশোহর মনোহর চক্রবর্ত্তী বলিয়া একটী লোক ছিলেন। তিনি একদিন কোন স্থান হইতে বাটী আসিতেছেন। সহসা পথে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন তিনি একখানি ছোট নৌকা সম্মুখে দেখিয়া তাহা মাথায় ধরিয়া বাটী আসিলেন। জিলা ফরিদপুর, কানাইপুর গ্রামে রূপচন্দ্র শিকদার নামে একটী লোক ছিলেন, তিনি ৭।৮ হাত উচ্চ অশ্বথের ডাল লাফাইয়া ধরিয়া, এবং নীচু করিয়া তাহার একটী পালিত মেষশাবককে তাহার পাতা খাওয়াইতেন। সচরাচর সকলেই ১॥। ২ মোণ ওজনের জিনিষ অনায়াসেই তুলিতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ বলশালী কয়জন লোক সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়? এক্ষণে প্রায় অধিকাংশ লোকই রুগ্ন, শীর্ণ ও হীন বলসম্পন্ন। এবং সকলেই চিররোগী, ও নিস্তেজ এবং আজীবন ব্যাধিগ্রস্ত থাকিয়া সর্ব্বদাই অসীম রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। কিন্তু সে সময়ে কোন ব্যক্তিকেই চিররোগী বা বারমাস ত্রিশ দিন ব্যাধিগ্রস্ত দেখা যাইত না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কাহাকেও ঔষধ সেবন করিতে হইত না। কখন কখন ১ বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল অতীতে জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত হইলে সামান্য ঔষধাদি সেবন করিতে দেখা গিয়াছে।

তাঁহাদের এতাদৃশ সুস্থ ও ব্যাধিশূন্য শরীর থাকাতে, পরিপাক শক্তিও বিলক্ষণ ছিল। স্বভাবতঃ সকলেই ১।১॥ সের তণ্ডুলের অন্ন এবং তৎপরিমাণে উপকরণ আহার করিতেন। তৎভিন্ন

অনেকেই ১টী রোহিত মৎস্য, একটী পাঁঠা ও ভোজনান্তে ৪।৫ সের মিষ্টান্ন ও ৪।৫ সের পরিমাণে পীষ্টক বা পরমান্ন কিম্বা দধি অনায়াসেই ভোজন করিয়া কোনরূপ অসুখ বোধ করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিরই এতাদৃশ পরিপাকশক্তি দৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ ব্যক্তিকেই একপোয়া দাদখানি, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কয়েকটী চুনা মৎস্যের আদ্রক-সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ঝোল, আদপোয়া সূর্য্য পক্ক দুগ্ধ সেবন করিয়াও অম্লোদ্গার, উদরের তীব্র বেদনা ৪।৫ বার তরল দাস্ত প্রভৃতি যন্ত্রণা অনুভব করিতে দৃষ্ট হয়। এতাদৃশ লোক তখন সমাজে ছিল না, বলিলেও বলা যাইতে পারে। আদ মোণি "কৈলাসের" কথা অনেকেই শ্রুত আছেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ আধ মোণ জিনিষ আহার করিতে পারিতেন।

তখন দেশে রেলওয়ে, ষ্টিমার কিছুমাত্র ছিল না। তজ্জন্য সে সময়ের লোকে কাশি, গয়া ও শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে পদ-ব্রজে গমনাগমন করিতেন। সচরাচর ১৫।১৬ ক্রোশ পথ সকলেই উপর্য্যুপরি ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তি ৩।৪ ক্রোশ পথও গমন করিতে সক্ষম নহেন। যদি কখন কোন ব্যক্তি অগত্যা ৩।৪ ক্রোশের পথ গমন করেন, তবে ৪।৫ দিন পর্য্যন্তও তাঁহাকে শয্যাগত থাকিতে দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যাধি।

তখন দেশে কলেরা ও বসন্ত এই দুইটি ব্যাধির বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। কলেরাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য্য বলিয়া স্থিরিকৃত হইত। সুতরাং রোগী আশু মৃত্যু চিন্তা করিয়া এককালীন অবসন্ন হইয়া পরিতেন। এবং আত্মীয়স্বজন বর্গও হতাশ হইয়া নিরাশার প্রশান্ত হ্রদে নিমগ্ন হইতেন।

বস্তুতঃ তখন কলেরা এতদূর সাংঘাতিক ব্যাধি ছিল যে, কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কখনও ২৪ ঘণ্টা কখন বা ১২ ঘণ্টা এবং ব্যাধির তীব্র আক্রমণ হইলে কখন কখন একবার ভেদ বমি হইলেই রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেন। কোন গ্রামে কলেরা উপস্থিত হইলে, উক্ত রোগে বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ নষ্ট করিত। কিন্তু ৪।৫ দিনের অধিক ব্যাধির তীব্র আক্রমণ থাকিত না। এই অল্প সময় মধ্যেই গ্রামে মহামারী উপস্থিত হইত। এবং বহুল সুদৃশ্য ও জনপূর্ণ গ্রাম এককালে জনশূন্য হইয়া যাইত। জিলা যশোহরের মামুদপুর, ও জিলা বগুড়া বেল আমলা জিলা ফরিদপুর, বাণিয়াবহ, এবং অন্যান্য অনেক স্থানে কলেরা উপস্থিত হইয়া—(পুষ্করা লাগিয়া) সেসকল গ্রাম একেবারে উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানেও সেই সমুদায় স্থানের পূর্ব্ব সৌন্দ-

র্য্যের বহুল চিহ্ন বিজন অরণ্য মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শতকরা ৫টি রক্ষা পাইত কিনা সন্দেহ।

চৈত্র মাসেই কলেরার বিশেষ প্রকোপ দৃষ্টিগোচর হইত। কখন কখন কার্ত্তিক মাসেও দেখা গিয়াছে। চৈত্রমাসে কলেরা উপস্থিত হইয়া যেমনই বৃষ্টি পতিত হইল, অমনি কলেরার প্রকোপ অন্তর্হৃত হইয়া যাইত। কার্ত্তিক মাস অপেক্ষা, চৈত্র মাসেই কলেরার ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ পাইত।

কিন্তু বর্ত্তমান্ সময়ে কলেরা রোগের আর কালাকাল নাই। কি গ্রীষ্ম, কি শীত, কি বর্ষা, সকল সময়েই উক্ত রোগ দেশে বিরাজ করিতেছে। যেন কলেরা, কায়েমী মৌরসী পাট্টা লইয়া বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু শাসনের কাঠিন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে কলেরাক্রান্ত রোগী শতকরা ৩০।৪০টী আরোগ্য হইতে দেখা যায়। অন্যান্য সময় অপেক্ষা বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত কলেরার প্রকোপ কিঞ্চিত হ্রাসতা দৃষ্ট হয়।

অতি পূর্ব্ব সময় হইতেই বসন্ত রোগে বহু সংখ্যক লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। বসন্ত রোগ কলেরা অপেক্ষা কম সাংঘাতিক ছিল না। বরং কলেরা অপেক্ষা বসন্তই সমধিক যন্ত্রণাদায়ক বলা যায়। "সোপাপিষ্ট ততধিকং"। বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ যন্ত্রণায় অপরিসীম কষ্ট ভোগ করিয়া অনতিকাল মধ্যেই প্রাণ বিয়োগ হইত। কোন কোন ব্যক্তি অতি কষ্টে

রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেও, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন বর্ত্তমান থাকিত। সে সময় কথায় বলিত "সমন্ধের ঘাট্ আর বসন্তের থাট" কখনই দূর হয় না।

৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে দেশে বসন্ত রাগেরে প্রকাশ অনেকাংশে হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেশে বসন্তের প্রাদুর্ভাব পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর বঙ্গ প্রদেশেই বসন্তের প্রকোপ সমধিক দৃষ্টিগোচর হয়।

তখন দেশে সিফিলিস, ও গণরিয়া এবং তৎসংক্রান্ত গাউট, প্রভৃতি ঘৃণিত ব্যাধি সকলের বিশেষ প্রবলতা দৃষ্ট হইত। দেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোক উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া চির জীবনের তরে স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষার এবং সভ্যতার—সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্যাধি দেশ হইতে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। এতৎভিন্ন প্লীহা, আমাশয়, রক্তামাশয় ও শ্বাসকাশ প্রভৃতি ব্যাধির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, পূর্ব্ব সময়ে দেশে জ্বর রোগের বিশেষ প্রবলতা ছিলনা। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি জ্বরাক্রান্ত হইয়া বিকার পাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেন। তৎভিন্ন সচরাচর অনেকেই বৎসরান্তে ৫।৭ দিন জ্বর ভোগ করিয়া অল্প সময় মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে জ্বর রোগের বিশেষ প্রবলতা দৃষ্ট হয়।

তখন দেশে বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতপত্তিক এবং পালা জ্বর ও ত্র্যাহিক জ্বর প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দেশে নানাবিধ নূতন নূতন জ্বরের আমদানি হইতে থাকিল। যথা ডেঙ্গুজ্বর, কালাজ্বর ইনফ্লুএঞ্জাজ্বর ও ম্যালেরিয়াজ্বর ইত্যাদি

১২৮১ সালে প্রথমতঃ ডেঙ্গুজ্বর, বঙ্গদেশে প্রকাশ পাইল। ডেঙ্গু জ্বর ততদূর প্রাণনাশক ছিল না। কেবল রোগী ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও প্রবল জ্বর ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ করিতেন। বঙ্গদেশে প্রায় ঘরে ঘরেই ডেঙ্গু জ্বর বিরাজ করিতে থাকিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই (ব্লাকফিবার) কালাজ্বরের কিছু কিছু প্রকোপ দেখা দিল। কালাজ্বর অত্যন্ত ভীষণ বেগে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইল। এমন কি ২৪, ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর প্রাণ বায়ু বহির্গত হইতে লাগিল।সেই সময়ে সাহিত্য সমাজের সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের সুধাময়ী লেখনী প্রসূত "বঙ্গ-দর্শন" মাসিক পত্রিকা সমাজে প্রকাশ হইতেছিল। উক্ত পত্রি-কায় ডেঙ্গু ও কালাজ্বর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। ডেঙ্গুজ্বর যমরাজার নিকটে রিপোর্ট করিতেছে।

মহামহিমমহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত যমরাজ মহাশয়
প্রবল প্রতাপেষু।

আমি মহারাজের আদেশে বঙ্গদেশে পদার্পণ করতঃ সমগ্র দেশে হুজুরের একাধিপত্য বিস্তার করিতেছি। কিন্তু আমি অতিশয় ক্ষীণজীবি, একারণ একাকী সমুদায় দেশ সম্যক রূপে শাসন করিতে পারিতেছি না। অনতিবিলম্বে প্রবল প্রতাপশালী

কৃষ্ণদাদাকে প্রেরণ করিবেন, হুজুরের গোচরার্থে বিস্তারিত নিবেদন করিলাম ইতি।

আজ্ঞাধীন।

শ্রীডেঙ্গুচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা।

উক্ত উভয় প্রকারের জ্বর ৩।৪ বৎসর দেশে রাজত্ব করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। তৎপর ১২৯৬ সালে ইনফুলঞ্জা ফিভার আসিয়া দেশে উপস্থিত হইল। এবং ২।৩ বৎসর অবস্থিতির পর দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া গেল।

ইহার পর ১৩০৫ সালে সদ্য প্রাণহন্তা প্লেগ, ভীষন মূর্ত্তি ধারণ করতঃ দেশে উপনীত হইল। প্লেগ, প্রথমতঃ বোম্বে মহানগরীতে প্রকাশ পাইল। ইন্দুর হইতে প্লেগের সৃষ্টি, এই জনপ্রবাদ অবলম্বনে গবর্ণমেণ্ট হইতে ইন্দুর হত্যার আদেশ প্রচারিত হইল। রাশি রাশি ইন্দুরের জীবন নষ্ট হইতে লাগিল। অতি অল্পদিন মধ্যেই সেই সমৃদ্ধিশালিনী এবং বহুল জন পূর্ণ বোম্বে সহর নির্জ্জন শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া, ভুবনবিজয়ী প্লেগ বীরহুঙ্কারে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করতঃ কলিকাতা রাজধানী আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং অধিবাসীগণের প্রাণ নষ্ট করিতে থাকিল। বোম্বের অবস্থা দৃষ্টি করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্লেগ, নিবারণ জন্য যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্লেগ সংক্রামক ব্যাধি, এইজন্য নিয়ম প্রচার হইল যে "কোন ব্যক্তির প্লেগ হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ হস্‌পীটলে পাঠাইয়া, সে গৃহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা হইবে"। তদনুসারে পুলিশ হস্‌পিটল হইতে একপ্রকার রোগীর

গাড়ী আনিয়া রোগীকে হস্‌পিটলে প্রেরণ করিয়া, সে গৃহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পাঠক! গবর্ণমেণ্টের এই শুভকর উদ্দেশ্যের ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। জীবিত সন্তানকে পিতামাতার ক্রোড় হইতে জোর করিয়া হস্‌পিটালে লইয়া যাওয়া যে কতদূর লোমহর্ষণ ঘটনা, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে। কলিকাতা সহরের উপরে প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্লেগের ডাক্তার ও পুলিশ ঘুড়িতে লাগিলেন। কোন্ বাড়ীতে কাহার প্লেগ হইল, প্রত্যেক দিন তাহার রিপোর্ট হইতে লাগিল। প্রত্যেক রেল ষ্টেশনে প্লেগের ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া আরোহি-দিগকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে সহসা একটা অলীক জনরব উঠিল "প্লেগের টীকা দেওয়া হইবে" ইত্যাদি কারণে সহরের প্রত্যেক লোকের মনে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায়, অসংখ্য লোক কলিকাতা পরিত্যাগ করতঃ চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কলিকাতা থাকিলেন, তাঁহারা ভীতচিত্তে স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া নানারূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা উপ-স্থিত করিলেন। পুলিশের লোক ও ডাক্তারদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং অধীবাসীগণ দলে দলে কারাগারে প্রেরিত হইতে থাকিলেন। ক্রমশঃ এই ভীষণ কাণ্ড মফঃস্বল জিলা ও পল্লী-গ্রামসমূহে উপস্থিত হইল। "ঐ প্লেগের টীকাদার আসি-য়াছে" বলিতে বলিতে লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া গ্রামের বহুসংখ্যক লোক চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া একত্র জড় হইল। দেশে একটা মহা হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল।

সেই সময়ে অতীব সূক্ষ্মদর্শী মহামতি 'উড্‌বরণ' বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এই সমুদয় ভীষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া প্লেগের রোগীকে হস্‌পিটালে লওয়ার নিয়ম রহিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করতঃ স্বীয় সুবিবেচনার পরিচয় প্রদর্শন করিলেন।

বর্ত্তমান সময়েও কলিকাতায় সময় সময় প্লেগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং এক্ষণে সমগ্র বঙ্গদেশে 'ম্যালেরিয়া' ফিভার প্রবল রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তজ্জন্য অসংখ্য বঙ্গবাসী প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

চিকিৎসা।

তখন নিদান শাস্ত্রোক্ত কবিরাজি চিকিৎসাই দেশে প্রচলিত ছিল। ভিন্ন দেশীয় ডাক্তারি চিকিৎসার তাদৃশ প্রচলন ছিল না। এবং দেশের লোক ডাক্তারি চিকিৎসার পক্ষপাতীও ছিলেন না। কোন ব্যক্তির জ্বর হইলে অষ্টজ্বরা, অর্থাৎ জ্বরা-গমের আট দিন মধ্যে হাত দেখানের নিয়ম ছিল না। এই আট দিন রোগীকে লঙ্ঘনেই রাখা হইত। তখন চিকিৎসা-শাস্ত্রোক্ত একটী বচন দেশে প্রচলিত ছিল। "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্য জ্বরান্তে লঘু ভোজন" এবং অনেকে বলিতেন, "জ্বর আর পর খেতে না পেলে, আপনেই চলিয়া যায়" এইজন্য জ্বরের প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়ার নিয়ম ছিল। সঙ্গে সঙ্গে "ছেঁচা কোঁচা" অর্থাৎ সেফালিকা ফুলের পাতা, কেঁওকড়া ও আদা একত্রে ছেঁচিয়া, তাহার রস লোহাদাগ করিয়া রোগীকে সেবন করান হইত। রোগী ইহাতেই প্রায় আরোগ্য হইতেন। অন্যথায় কবিরাজ ডাকা হইত। কবিরাজেরা রোগীর হাত দেখিয়া; পিত্তশ্লেষ্মা, বাতশ্লেষ্মা ও বাতপৈত্তিক প্রভৃতি জ্বরের ব্যবস্থা করিয়া সাদা লক্ষ্মীবিলাস, নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস ও কফচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ, পানের রস কিম্বা আদার রস, মধু, পিপ্পলী চূর্ণ, শুণ্টিচূর্ণ

প্রভৃতি অনুপান সহযোগে এবং সঙ্গে সঙ্গে দশমূল পাচন, চতুর্দ্দশাং পাচন ব্যবস্থা করিতেন। এই সকল ঔষধ ও পাচন ব্যবহারে রোগী অল্পদিন মধ্যেই আরোগ্য হইতেন। কখন কখন জ্বর কঠিন হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে, মহালক্ষ্মীবিলাস, কস্তুরী-ভৈরব, স্বর্ণসিন্দূর প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে। সে সময় অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে রোগী অল্পদিনেই আরোগ্য হন বটে, কিন্তু তখন যেমন দীর্ঘকাল স্বাস্থ্য ভোগ করিতেন, এক্ষণে আর লোকের সেরূপ স্বাস্থ্য নাই, বারমাস ত্রিশ দিনই জ্বর ভোগ করিতে হয়।

ক্রমশঃ দেশে ডাক্তারী (য়্যালোপ্যাথিক) চিকিৎসার সূত্রপাত হইল। প্রথমতঃ জেলা সমূহে ক্রমে পল্লীগ্রাম সমুদায়ে ডাক্তারি চিকিৎসা প্রকাশ পাইল। জ্বরের নাম বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া রেমিটেন্ট, ইণ্টারমিটেণ্ট. কণ্টিনিউট ফিভার নাম ব্যবহৃত হইতে লাগিল। লক্ষ্মীবিলাস, কফচিন্তামণি, দশমূল পাচনের পরিবর্ত্তে ফিভার মিক্শ্চার, কুইনাইন মিক্শ্চার, টনিক মিকশ্চার দেখা দিল।

প্রথমতদেশের অনেক লোকেই সহসা আরোগ্য হওয়ার প্রত্যাশায়, অষ্টজ্বরার অপেক্ষা না করিয়া সাদা কুইনাইন ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এবং প্লীহা-ঘটিত পুরাতন জ্বরাক্রান্ত রোগীর জন্য বান্ধা পুরিয়া,(স্প্লীন পাউডার) ব্যবহার হইতে লাগিল। অর্থাৎ কুইনাহন, জোলেফা, রেউডিনী, জিঞ্জার প্রত্যেক ৫ গ্রেণ করিয়া ১ পুরিয়া বান্ধিয়া, সাত দিন কিম্বা চৌদ্দদিন

দিবসে এক এক পুরিয়া সেবন করিলে, রোগী আরোগ্য লাভ করিত। পথ্য—ঘৃতপক্ক বুটের ডাইল প্রভৃতি ব্যবহার হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে ডাক্তারী চিকিৎসা সম্যকরূপে দেশে প্রচলন হইল এবং কবিরাজি চিকিৎসা দেশ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তখন সাদা কুইনাইন ২½ রতি (৫ গ্রেন) জ্বর বিচ্ছেদে একবার সেবন করিলেই অমনি জ্বর বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু অধুনা কুইনাইন দেশীয় লোকের সেবন অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ায়, এক্ষণে ৫ গ্রেণ কুইনাইন সেবন কিম্বা ১ দিন কুইনাইন প্রয়োগে আর জ্বর বিচ্ছেদ হয় না। ২০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন ২ দিবস ব্যবহার না করিলে জ্বর বিচ্ছেদ হইতে দৃষ্ট হয় না।

সেই সময়ে বসন্তরোগে দেশীয় লগ্নাচার্য্যগণের (টীকা) দেওয়ার নিয়ম ছিল। তাহারা মনুষ্য বীজে টীকা দিতেন, অনেক স্থলে টীকা দেওয়ার পর বহুল পরিমাণে গুটি উঠিয়া রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হইতেন। তৎকালে বসন্তকে লোকে দেবতা মনেকরিতেন, একারণ টীকা দেওয়ার পূর্ব্বে ও রোগী আরোগ্য হইলে বসন্ত-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করা হইত। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট হইতে গোবীজে টীকা দেওয়ার পদ্ধতি প্রকাশ হইল। এই নিয়মে টীকা দিলে রোগীর কোন আশঙ্কা দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব্ব নিয়মে টীকা দিলে একবার ভিন্ন জীবনে আর টীকা দিতে হইত না। গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত নিয়মে ২।৩ বার টীকা লইতে হয়।

তৎকালে সিপিলিস্ ব্যাধি আরোগ্য জন্ত অনেকে মুখ আনাইতেন। তাহাকে সাধারণে "মারকুলি" বলিত। সে চিকিৎসা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ছিল। দেশের বহুতর ব্যক্তি উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসাধীন হইতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত ব্যাধি দেশ হইতে প্রায় দূরীভূত হওয়ায় 'মুখ আনা' চিকিৎসা আর দেখা যায় না। যদিচ কোন ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হন, তবে মুখ আনান চিকিৎসার পরিবর্ত্তে এক্ষণে অন্য প্রণালীতে তাহার চিকিৎসা হইয়া থাকে। এক্ষণে ডিককৃসন সার্জা, আওডাইড অব পটাশ ব্যবহারেই উক্ত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মুখ আনানের পরে কেহ কেহ ডিককসন সার্জা (সালসা) ব্যবহার করিতেন। তাহাকে 'মসল্লার জল' বলা হউত।

অতি পূর্ব্বে ডাক্তারি চিকিৎসায় জলৌকা প্রয়োগ পদ্ধতি দেখা যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, সে প্রণালী আর অবলম্বন করা হয় না। তখন দেশে একটী জনপ্রবাদ ছিল "জোঁক,জোলাপ, পীচকারী, এই তিন লয়ে ডাক্তারী।"

তৎকালে দেশে "হোমিওপ্যাথিক" চিকিৎসার সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি দেশের লোকের তাদৃশ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল না। অনেকেই বলিতেন, "হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করা আর হরির নামে থাকা একই কথা।" হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা তখন বিনা ভিজিটে রোগীর চিকিৎসা করিতেন। ক্রমশঃ ডাক্তার সরকার প্রভৃতি

সুচিকিৎসকগণের প্রযত্নে উক্ত চিকিৎসার সুফল দৃষ্টে, দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিশেষরূপে প্রচলিত হইল। বর্ত্তমানে দেশের লোক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপকারিতা এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন। এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণও রীতিমত ভিজিট লইয়া চিকিৎসা করিতেছেন।

তখন জ্বর রোগে রোগীকে কাঠ খোলার খই, দোভাজা চিড়া, চিড়ার জল, খইর মণ্ড, মশুরির ক্বাথ পথ্য দেওয়া হইত। তৎপরে জ্বর বিচ্ছেদে, 'খিচড়ি' (এক ভাগ চাউল ৩ ভাগ মশুরের ডাইল) ব্যবস্থা করা যাইত। তৎপর ঠটিয়া কলা, কুসি বেগুন, ডুমুর প্রভৃতি তরকারি এবং কানিঝাড়া ভাত; ক্রমশঃ ক্ষুদ্র মৎসের ঝোল দেওয়া হইত। ৭।৮ দিন না গেলে দুগ্ধ দেওয়ার নিয়ম ছিল না। এবং তেজপত্র, পিপ্পলী চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া রোগীকে ব্যবস্থা করা হইত।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে চিড়া ভাজা, মশুরির ক্বাথ, "৩ ভাগ ডাইল, এক ভাগ চাউলের খিঁচড়ি" ঠটিয়া কলা, কুসি বেগুণ, ডুমুর, ক্ষুদ্র মৎসের ঝোল আর ব্যবস্থা নাই। জ্বরের মধ্যেই দুগ্ধের ব্যবস্থা করা হয়। কখন কখন মাংসের যুশও রোগীকে দেওয়া হইয়া থাকে।

কিছুদিন পূর্ব্বে চিড়া ভাজা, চিড়ার জলের পরিবর্ত্তে "সাগু" দানা ব্যবহার হইতেছিল। ক্রমশঃ এরারুট, "বালী" "বিস্কুট" দুগ্ধরুটি প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে।

তখন জ্বর, মধ্যে রোগীর হাত পার জ্বালা হইলে, মনসা

সেজারের পাতার রস, তৈল জল মিশ্রিত, এবং মস্তক ঘূর্ণিতাবস্থায় পুরাতন ঘৃত ব্যবহার হইত, কিন্তু এক্ষণে "ল্যাভেণ্ডর, অডিকলম। (ভিনিগার) ব্যবহৃত হয়। এবং শিশুদিগের পীড়াতে তখন গৃহ চিকিৎসাই প্রশস্ত ছিল। (ঠাকুর মার মুষ্টি যোগেই) ব্যাধির শান্তি হইত। কিন্তু এক্ষণে ডাক্তারের আশ্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

সে সময় কবিরাজের চিকিৎসায় লোকের অতিশয় ব্যয়ের সাহায্য ছিল। কারণ কোন রোগীর চিকিৎসা জন্য কবিরাজ ডাকিলে,তাঁহার দর্শনী এক টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিশেষ গণ্য মান্য কবিরাজ হইলে, তাঁহাকে দুই টাকা দর্শনী দিতে হইত। তৎপর ব্যাধি আরোগ্য হইলে আর দুই এক টাকা দিলেই কবিরাজেরা সন্তুষ্ট হইতেন। বেশী দিন চিকিৎসা করিতে হইলে, ব্যাধির মধ্যেও কিঞ্চিৎ দিতে হইত। কিন্তু ঔষধের মূল্য আর স্বতন্ত্র দেওয়ার নিয়ম ছিল না। এবং রোগ কঠিন হইলে, কবিরাজ বাটীর উপর থাকিতেন। কখন কখন রোগের অবস্থা বিশেষে কবিরাজেরা দুই তিন বারও রোগীর বাটীতে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু তজ্জন্য প্রত্যেক বার টাকার দাবি করিতেন না। তৎপর রোগী আরোগ্য হইলে যদি রোগীর অবস্থা ভাল হইত, তবে পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম ছিল, বস্তুতঃ তখন সামান্য জ্বরে পাঁচ টাকার, অবং কঠিন ব্যাধির ৫০ টাকার অধিক ব্যয় হইত না।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ডাক্তারি চিকিৎসায় লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ব্যয় হইয়া থাকে। এক্ষণে আর দর্শনী শব্দ

প্রয়োগ হয় না। দর্শনীর নাম "ভিজিট" হইয়াছে। ২৲ টাকার নীচে 'ভিজিট' নাই। এরপর ৪।৮।১৬৲ টাকা পর্য্যন্তও 'ভিজিট' দিতে হয়। তৎপর ঔষধের মূল্য পৃথক দিতে হইবে। যতবার ডাক্তার বাবু বাটীতে আসিবেন, ততবারই পুরা মাত্রায় 'ভিজিট' গ্রহণ করিবেন। এবং রাত্রিতে আসিলে ডবল 'ভিজিট' চার্জ্জ হইবে। অতঃপর রোগীর বাটীতে থাকিলে, ১০।২০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত লওয়া হয়। যদি রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে রোগী রোগ-যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু আত্মীয় স্বজনের ডাক্তারের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। শ্রাদ্ধের পর, পর দিন ডাক্তারের বিল আসিয়া বাটীতে উপস্থিত হইল। এবং আত্মীয়েরা উপস্থিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া ডাক্তারের দেনা পরিশোধ করিলেন। কোন কোন ডাক্তারকে বিলের টাকার জন্য আদালতে নালিশ করিতেও দেখা যায়। একটী ডাক্তার তাঁহার বিলের ৫০৲ টাকার দাবিতে আদালতে নালিশ করিয়াছিলেন। মুনসেফ বাবু রায় দিলেন "দাবি কৃত ৫০৲ টাকার মধ্যে জল বাদে ১০৲ টাকা ডিক্রী দেওয়া গেল।" কিন্তু তখন কবিরাজদের টাকার জন্য কখনও আদালতে নালিশ করিতে দেখা যাইত না।

বস্তুত বর্ত্তমান সময়ে ডাক্তারী চিকিৎসায় সাধারণতঃ ১০।১৫।২০ টাকার কম চিকিৎসা হয় না। এরপর পীড়া কিছু কঠিন হইলে ২০০।৫০০ শত, অনেকস্থলে হাজার পর্য্যন্তও ব্যয় হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সঙ্গীত চর্চ্চা।

সে সময়ে দেশে নানাবিধ সঙ্গীতের আলোচনা ছিল। যথা কবি, যাত্রা, চপ, কীর্ত্তন, পাঁচালী, রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, বিদ্যাসুন্দর, খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা প্রভৃতি। দেশের বহুবিধ ব্যক্তি ঐ সকল গানের দল বান্ধিয়া ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থ এবং যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

কবিগান।

তখন দেশে অনেক কবিওয়ালা প্রসিদ্ধ ছিলেন। কলিকাতা হরু ঠাকুর, ভোলাময়রা, যজ্ঞেশ্বর ধোপা, হরিবোল দাস, হারু কৈবর্ত্ত, গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য, মনোমোহিনী দাসী, শ্রীরামপুরের আণ্টুনী সাহেব, রামবসু, আজু গোঁসাই, সৌদামিনী বাই, উদ্ধব ও মাতপশারী, লোকনাথ ঘোষাল, হোসেন সেখ (ইহার দল পরিশেষে তর্জ্জানামে খ্যাত হয়, এবং হোসেন সেখই প্রথমে তর্জ্জা গান প্রচলন করেন) তৎপরে সীতানাথ ঠাকুর এবং যশোহর ,মধুপুরী, পূর্ব্ববঙ্গে ভৈরব ঠাকুর, প্যারীমোহন ঠাকুর, বিলাস, বিদেশিনী, চণ্ডীসরকার, বড় হরি, কানাই বলাই, ঈশান ঠাকুর, ভৈরব মজুমদার এবং অন্যান্য বহুবিধ ব্যক্তিগণ বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন। সেই সময়ে দেশে কবিগানের বিশেষ

আদর ছিল। প্রত্যেক বৎসর পূজার সময় পূজা-বাড়ীতে এবং অন্যান্য সময়েও প্রত্যেক আমোদজনক কার্য্যে দুই দল করিয়া কবিগান বায়না হইত। আশ্বিন মাসের প্রথমেই ঢাকা সহরে বহুসংখ্যক কবিওয়ালা বাসা করিয়া থাকিতেন। গ্রাহকগণ পছন্দ মত দল বায়না করিতেন।

কবিগান অতীব সুশ্রাব্য ও সুমধুর এবং হৃদয়বিমুগ্ধকর। কিন্তু কুরুচিসম্পন্ন শ্রোতাদের অভিরুচি অনুসারে অধিকাংশ স্থলে, দলের সরকারেরা নানাবিধ অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করায় কবিগানের একটী দুর্ণাম প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ কবিগান ঘৃণিত নহে। কবিগানের ডাক মালসী, ভবানা বিষয়, গোষ্ঠ, নন্দ বিচ্ছেদ, যশোদার বিচ্ছেদ, ছিদাম বিচ্ছেদ, প্রভৃতি গানগুলি শ্রবণ করিয়া শ্রোতাগণ কিছুতেই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না। এতদ্ভিন্ন সখীসংবাদ, বসন্ত, টপ্পা, কবির লহর প্রভৃতি গানগুলি প্রশ্ন ও উত্তর ছলে সম্পন্ন হয়, এবং অতি বিশুদ্ধ ভাবে প্রশ্ন উত্তর সম্পাদিত হইয়া থাকে। এক দলের সরকার প্রশ্ন করিলে অন্য দলের সরকারের তখনই মুখে মুখে উত্তর করিতে হয়। প্রশ্ন করাকে 'বেড়ক' বা 'চাপান' এবং উত্তর করাকে 'উত্তর' বলে। এইরূপ প্রশ্ন উত্তরে উভয় দলের সরকারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ও সুশিক্ষার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নানাবিধ শাস্ত্র হইতে প্রশ্ন হওয়ায়, সরকারদের সমুদায় শাস্ত্রেই ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। কবির দলের সরকারদিগের একটী বিশেষ প্রশংসা আছে, অর্থাৎ অনেক সরকারকে দেখা যায়, তাহারা

লেখা পড়া কিছুই জানে না, কিন্তু গান রচনায় ও উপস্থিত বোলে বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়া থাকে। গোষ্টের পাঁচালী ও উপস্থিত বোল প্রভৃতিতে সরকারগণ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

দুই দল না হইলে কবিগানের পাল্লা চলে না। কারণ একদলে প্রশ্ন করিলে অন্য দলে উত্তর করিবে। বিশেষতঃ কবিগান অতি উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে হয়। বিশ্রাম না পাইলে গান করা কঠিন। এই জন্যই দুইদল একত্র হইয়া গান করিয়া থাকে। তখন প্রত্যেক দলেরই প্রতিদ্বন্দ্বী দল নির্দ্দিষ্ট ছিল। বায়না করিবার সময়ে উক্ত উভয় দল বায়না করা হইত। য়্যাণ্টুনী সাহেবের সহিত হরু ঠাকুরের, যজ্ঞেশ্বর ধোপার সহিত, ভোলা ময়রার, সৌদামিনীর সহিত রাম বসুর এবং অন্যান্য দলের সহিত অন্যান্য দলের পাল্লা চলিত।

য়্যাণ্টুনী সাহেব একজন ফিরিঙ্গি ছিলেন। এবং এদেশে একটী কবির দল বান্ধিয়া গান করিতেন। তিনি ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস, এবং হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ভবানী বিষয় প্রভৃতি বহুবিধ গান স্বয়ং রচনা করিয়া আসরে গাইতেন। এবং প্রত্যেক গানেই সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর অপূর্ব্ব মহিমা বর্ণন করিয়া ঐকান্তিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। এটী তাঁহার কম প্রশংসার বিষয় নহে। তাঁহার প্রণীত কয়েকটী গান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

(১) জানিগো জানিগো তারা, তুমি মা ভোজ রাঙ্গের বাজি ;
এমা ! যে জন যেরূপে ভজে, সেই রূপেতে হওমা রাজি ;
এমা ! মগে বলে ফারা তারা, মাগো ! (গড্) বলে ফিরিঙ্গি যারা ;
এমা ! আল্লা তালা বলে ডাকে মোগল, পাঠান, সৈয়দ কাজি।

(২) "য়্যাণ্টুনী ফিরিঙ্গি বলে যুড়িয়া যুগল পাণি ;
এমা অন্তিম কালে দিও তারা তব রাঙ্গা চরণ দুখানি।

একদিন য়্যাণ্টুনী সাহেব হরু ঠাকুরের সহিত একটী পূজার বাড়ীতে পাল্লা করিতেছিলেন। য়্যাণ্টুনী সাহেব আসরে আসিয়া একটী ভবানী বিষয় গান করিলেন।

"যদি নিজগুণে তার মোরে এভবে মাতঙ্গী ;
ভজন সাধন জানিনা মা জাতিতে ফিরিঙ্গী।"

হরু-ঠাকুর, পর আসরে আসিয়া উত্তর করিলেন।

"তুই জাত ফিরিঙ্গী, জবর জঙ্গি, পার্ব্ব না তোরে তরাতে ;
যীশুখ্রীষ্ট ভজ গিয়া তুই শ্রীরামপুরের গির্জ্জাতে।"

ভোলা ময়রা এবং যজ্ঞেশ্বর ধোবা একদিন পাল্লা করিতেছিলেন। যজ্ঞেশ্বর ধোবা ভোলা ময়রাকে পাগল বলিয়া তিরস্কার করিবার মানসে, গানের আসরে বলিলেন "ভোলানাথ যেন সাক্ষাৎ ভোলানাথ শিব।" সুচতুর ও সুরসিক ভোলা তাহা বুঝিতে পারিয়া ফের আসরে আসিয়া টপ্পা গাইল ঃ—

"আমি সে ভোলানাথ নই। আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা বাগবাজারে রই। যদি সে ভোলানাথ হই, তবে শিব-লিঙ্গ সবাই পূজে 'আমার লি—পূজে কই।"

"ভোলা ময়রা অতিশয় কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন। একদিন ভোলা ময়রা গোষ্টের পাঁচালী বলিবার সময়ে অতি সুমধুর ও মন মুগ্ধকর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিতে-ছিলেন। কিন্তু ভোলা ময়রার দলে শ্রীকৃষ্ণ নামে একটী ব্রাহ্মণ দোহার ছিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি যজ্ঞেশ্বর ধোবা সেই আসরেই একটী গান বেড়ক করিল ;—

"তুমি শুন হে ময়রা ভোলা ঠাকুরকে বিশ্বাস করনা। দ্বাপরেতে, যশোদার ঘরেতে, ননী খেলে ভাণ্ড ভেঙ্গে ; দেখ সেইরূপে যেন তোমার ঘরে রসের ভাণ্ড ভাঙ্গে না।"

একদিন হরু-ঠাকুরের ভ্রাতা নিলু ঠাকুর, রাগ করিয়া হরু-ঠাকুরের দল পরিত্যাগ করিয়া ভোলা ময়রার দলে প্রবেশ করেন। তৎপরে ভোলা ময়রার সহিত হরু-ঠাকুরের একদিন পাল্লা চলিতে-ছিল। হরু-ঠাকুর টপ্পা বেড়ক করিলেন :—

যেমন ঢাকের পাছে বামা থাকে বাজে না সে কোন দিন, তেম্নি আজ ভোলার দলে নিলু ভাই—হয়েছেন একটিন।"

তখন দেশের অনেক ভদ্র লোকের সখের কবির দল ছিল। ভাওয়াল-নিবাসী স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় মহোদয়ের সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীতা থাকায় তাঁহার একটী সখের কবির দল ছিল। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে ভাল ভাল দোহার ও সরকার সংগ্রহ করিয়া দল চালাইতেন। এবং নানা স্থান হইতে বড় বড় কবির দল বায়না করিয়া নিজ বাটীতে আনিয়া আপন দলের সহিত পাল্লা করিতেন। একদিন

কলিকাতার সীতানাথ ঠাকুরের দলের সহিত তাঁহার পাল্লা চলিতেছিল। সীতানাথ ঠাকুর টপ্পা বেড়ক করিলেন ;—

"ঢাকাতে তাঁতি ছিল কায়েত হলো ঢাকাই বাবু নন্দলাল, তেম্নি আজ ভাওয়ালেতে উদয় হলো বদরযোগিনীর পোসীলাল।"

অর্থাৎ বদরযোগিনীর, পোসিলাল, প্রধান শ্রোত্রীয়, রাজা বাহাদুর সেই পরিচয় প্রদান করিতেন। কিন্তু ঘটকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন, রাজা বাহাদুর বদরযোগিনীর পোসি-লাল নহেন। সীতানাথ ঠাকুর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সুতরাং তিনি এবিষয় জ্ঞাত ছিলেন। উদার হৃদয় রাজা বাহাদুর সীতা নাথ ঠাকুরের এইরূপ উৎপন্ন বুদ্ধির ভূয়সীঃ প্রসংশা করিয়া তাঁহাকে যথাযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন।

একদিন ভৈরব মজুমদারের সহিত ঈশান ঠাকুরের পাল্লা চলিতেছিল। ভৈরব মজুমদারের সরকার সুধন্নার বণিতা হইয়া—

শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া টপ্পা বেড়ক করিল,—

"ঠাকুর! তুমি সর্ব্বশক্তিমান ও ভক্ত বৎসল, দয়া করে আমার মৃতপতি সুধন্নার প্রাণ দান কর।" ঈশান ঠাকুরের দল হইতে উত্তর করা হইল :—

"বিধুমুখী রাজার মেয়ে কেন আর যন্ত্রণা বাড়াও।

কেন এসে সতী, প্রাণ পতি বারে বারে ফিরে চাও।

রণে ম'লে ক্ষত্রিয় সুত, হবে নাকো পেত্নী ভূত, রাজ কন্যে ফিরে ঘরে যাও। গিয়ে ঔশাচান্তে শ্রাদ্ধ করে জন কত বামন খাওয়াও।"

জিলা ফরিদপুর আলগী-নিবাসী কাশীশ্বর বক্সীর একটী সখেঁর কবির দল করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথ নামে তাঁহার একটী প্রধান দোহার ছিল। কিছু দিন পরে বৈদ্যনাথ কাশী বক্সীর দল পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে একদিন কাশী বক্সী গান করিবার সময় বিপক্ষ দলে বেড়ক করিল—"যখন বৈদ্যনাথ কাশী ছেড়ে গিয়েছেন, তখন কাশীর আর কিছু মাত্র মাহাত্ম্য নাই।" কাশী বক্সী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন :—

"কাশীর মাহাত্ম্য তত্ত্ব কেবা জান্তে পায়। শুনা আছে বেদাগমে, কোটী লিঙ্গ কাশীধাম, শিবের আশ্রমে; বৈদ্যনাথ তার একটী লিঙ্গ কোন হ'লে লো—ছেঁড়া যায়।"

এইরূপে অতি বিশুদ্ধভাবে ও অতি পরিপাটির সহিত তখন কবি গানের পাল্লা হইত। বর্ত্তমান সময়ে আর এইরূপ বিশুদ্ধতার সহিত প্রশ্ন উত্তর হয় না। এবং প্রায়ই অশ্লীল ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কবিগান মধ্যে ডাক মালসী, ভবানী বিষয়, বসন্ত, সখী সংবাদ প্রভৃতি গান গুলি বিশেষ প্রশংসনীয় ও চিত্তবিমুগ্ধকর। পাঠকগণের জ্ঞাত জন্য নিম্নে কয়েকটী গান উদ্ধৃত করা গেল।

ডাক মালসী।

ভব দুস্তারে নিস্তার তারা, ত্রাণ কর গো ত্রিলোক তারিণী।
তুমি ভবদারা ওমা তারা সদাশিবের মনোমোহিনীঃ।

এমা! শ্রীমন্তে দক্ষিণ মশানে, উদ্ধারিলে নিজগুণে হ'য়ে গো মা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ; এবার কৃপাকরে তার মোরে, এভবে মা ভবরাণীঃ।

ঝুমর।

ভবতরঙ্গে পড়ে তারা, ডাকি মা কোথা দীনতারিণীঃ।
এবার অকূলে কূল দেও গো তারা তুমি কূলকুণ্ডলিনীঃ।
এমা কাল হারালেম কালের বশে, কাল পেয়ে কাল ধরলে এসে,
তুমি মা কাল ভয়বারিনী ;
এমা কৃপা করে ; ভবনীরে নিস্তার মা নিস্তারিণী।

বসন্ত।

কালপেয়ে বসন্ত আসি উদয় ভূতলেঃ। ভয়ে বিরহিনী কম্পবান, মদন লয়ে পঞ্চবান প্রথমে প্রবেশে শ্যামের সাধের গদ্দলেঃ।

ছুটলো সৌরভ, ফুটলো বকুল, অলি রাজা মদে ব্যাকুল, শূন্য গকুল, গকুলপতি নাই, ব্রজের সেভাব নাই ; হায় হায়গো, বিচ্ছেদের অনুচর হেরে, পূর্ব্বকথা মনে করে, কৃষ্ণপ্রেম বিচ্ছেদশরে, মুর্চ্ছাগত রাইঃ ; রাইমলো রাইমলো বলে কান্দে সকলে ; ধেয়ে গিয়ে চন্দ্রাবলী, ওরে সখীগণের কাছে বলেঃ।

(রাই কেন আজ এমন হলো গো কি হলো রাইর বসন্ত কালেঃ)

এই আমি আসিলাম দেখে, সচৈতন্য শ্রীরাধিকে, ছিল দিব্য জ্ঞান ; এখন ধরায়ে পতিত প্যারী মুদিত নয়ান, হেমাঙ্গ হিমাঙ্গ হলো, কেউ বলে রাই মলো মলো, তোমরা সবে হরি বলো ওরে হরিপ্রিয়ার অন্তিম কালেঃ

(রাই কেন আজ এমন হলো গো কি হলো রাইর বসন্ত কালেঃ)

কি শোকে রাই সকাতরা, সখি, তোরা বল্‌গো সকলে।

পঞ্চাত্মা পঞ্চত্ব পেলে, জীবের জীবন অন্তকালে, তুলসী তলে করে অন্তঃজল; লক্ষণ সেই সকল (হায় হায়গো) আহা মরি কি বিচিত্র, নয়নে তুলসীর পত্র, নিত্যময়ীর শিবনেত্র, কি জন্যে তাই বল; যে অঙ্গ হৃদয়ে ধরে রাখ্‌তেন ভগবান; সেই অঙ্গ আজ কি কারণে, পড়ে আছে ধরাতলেঃ

(রাই কেন আজ এমন হলো গো কি হলো রাইর বসন্ত কালেঃ)

এই প্রকার নানাবিধ সুমধুর সঙ্গীত কবিগানে রহিয়াছে। বাহুল্য প্রযুক্ত আর অধিক উদ্ধৃত করা গেল না।

বর্ত্তমান সময়েও বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক কবির দল দৃষ্ট হয়। কিন্তু এক্ষণে কবিগানের আর সেরূপ আদর নাই এবং অধুনা সখের দল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে তারক কাঙ্গাল, গোবিন্দ তাঁতি, অম্বিকা সরকার, এবং অন্যান্য অনেক কবির দল বঙ্গদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যাত্রাগান।

অতি প্রাচীন সময়ে দেশে, নিমাই সন্ন্যাস, সাবিত্রী সত্যবান, ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র, দক্ষ যজ্ঞ, শিব বিবাহ, রাম বনবাস, সীতা বনবাস, নল দময়ন্তী প্রভৃতি পালা প্রচলিত ছিল। ক্রমে

রাধিকার মানভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন, দূতীসংবাদ, শ্রীমন্তমশান, প্রভৃতি পালার সৃষ্টি হইল। তৎপর কংশবধ, রুক্মিণী হরণ, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, অভিমন্যুবধ, সুধন্যা বধ, হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ, কর্ণবধ, ভীষ্মের শরশয্যা, প্রভৃতি পালার আবিষ্কার হয়। এবং বর্ত্তমান সময়ে প্রবীর পতন, গয়াসুরের হরি পাদপদ্ম লাভ, রুক্মাঙ্গদের হরিবাসর, নহুশের স্বর্গারোহণ, বলরামের তীর্থ পর্য্যটন, কালকেতু উদ্ধার, সুরথ উদ্ধার, প্রভৃতি পালার আলোচনা হইতেছে।

তখন গোবিন্দ অধিকারী, মাধব অধিকারী, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী, বকমিয়া, সাধুমিয়া, মদন মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গীতবিশারদ ব্যক্তিগণ যাত্রাগানের দল প্রস্তুত করিয়া সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতাদিগকে বিমুগ্ধ করিতেন। তৎপর লোকনাথ ধোপা, নীলকণ্ঠ, বউমাষ্টার, ব্রজরায়, বেচারাম চাটুর্য্যে, অহীভূষণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সঙ্গীত করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মতিলাল রায়, রসিক রায় (ইনি পূর্ব্বে বালক সঙ্গীতের দল করিয়াছিলেন) সাতরা কোম্পানী, গোর প্রামাণিক, প্রসন্ন ওস্তাদ ও তৎপরে মথুর সাহা, ভূষণ দাস প্রভৃতি বহুবিধ ব্যক্তি যাত্রা গান করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। এবং সময়ে সময়ে স্ত্রীলোকদিগের ও যাত্রার দল দৃষ্ট হয়।

কিন্তু সে সময়ে যাত্রা গানের যেরূপ প্রণালী প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বোধ হয়, নব্য সম্প্রদায়ের পাঠকগণ যাত্রাগানের পূর্ব্ব রীতি নীতি অনুভব করিতে

সম্পূর্ণ রূপে অসমর্থ হইবেন। তজ্জন্য আমরা যাত্রা গানের পূর্ব্ব নিয়ম কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

সঙ্গীত আরম্ভ সময়ে প্রথমতঃ আথরাই বাদ্য আরম্ভ হইত, বাদ্য যন্ত্র,—মন্দিরা, ঢোলক, তবলা, বেহালা কোন কোন দলে খোল করতালও থাকিত। তৎপরে, শ্যামা-বিষয়ক একটী আঁথড়াই গান হইত। এইরূপে আথড়াই গান বাদ্য শেষ হইলে একজন অল্পবয়স্ক বালক পেণ্টুলন চাপকান পড়িয়া টুপি মাথায় দিয়া একখানা রোমাল হস্তে নকীব সাজিয়া একটী হিন্দী গান গাইতে গাইতে আশরে উপনীত হইয়া বক্তৃতা করিত।

"রাজাধিরাজ মহারাজকো বার হোগা, আদ্‌মি সব বৈঠ যাও বৈঠ যাও আদ্‌পছে রহ।"

তৎপরে নকীব ঝাড়ুদারকে ডাকিত, তখন সাজঘর হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়ি গোপ লাগাইয়া, চূণ কালী মুখে দিয়া, ছেঁড়া নেকড়া পরিয়া, নুপূর পায় দিয়া, একগাছা ঝাটা বগলে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে উপনীত হইত। তারপর ভীস্তিওয়ালাকে ডাকা হইত। তখন ঐরূপে চূণ কালী মুখে দিয়া একটী ভিস্তী স্কন্ধে করিয়া, "দরিয়ার মিঠা পাণি লায়া বড় মজাদার" ইত্যাদি গান গাহিয়া ভীস্তিওয়ালা উপস্থিত হইত। ক্রমে, ঐরূপ চূণ কালী মুখে দিয়া কালুয়া, ভুলুয়া আসিয়া নানারূপ রহস্যজনক কথা বলিয়া নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গি ও নৃত্য করিয়া শ্রোতাবর্গকে হাসাইত। তৎপরে একখানি সাড়ী পড়িয়া "মেথ্‌রাণী, বা রক্ষী, "কেনে কালুয়া ডাকিস বারেবার" গান করিতে করিতে

রঙ্গভূমে উপনীত হইত। এই সমুদয়ের যাতায়াত ও গান ,এবং বক্তৃতাদি করিতে প্রায় ২।২॥০ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। ইহারা এইরূপে শ্রোতাদিগকে হাঁসাইয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। তৎপর নৃত্য আরম্ভ হইত। বালক-গণ, নৃত্য বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিত। বালকগণ মস্তকে একটী কলসী তদুপরি একটী ঝাড়ি, তার উপরে একখানা রেকাব এবং তাহার উপরে একটী জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া নৃত্য করিত।

নৃত্য শেষ হইলেই গানের পালা আরম্ভ হইল। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বালকগণ সজ্জিত হইয়া আসরে উপনীত থাকিত। তখন যে পালাটি গাইতে হইবে, তাহার সারাংশ সুর সংযোগে পদ্যে প্রকাশ করার নিয়ম ছিল। অর্থাৎ সীতা বনবাস পালাতে :—

আগ দোহারগণ—(রক্ষবংশ করিধ্বংস, রঘুকুল অবতংশ রঘু-পতি আসিয়া ভবনে।)

পাছ্ দোহারগণ—(হায় হায় রঘুপতি আসিয়া ভবনে)

আগ—(রাজ্য দিয়ে ভরতেরে, বঞ্চেন রাম অন্তঃপুরে, দিবা নিশি জানকীর সনে।)

পাছ্—(হায় হায় দিবানিশি জানকীর সনে)

আগ—ভগ্নীগণ সহ সীতা, বলেন মনের কথা, দিবানিশি হরষিত মনে।

পাছ্—(হায় হায় দিবানিশি হরষিত মনে)

আগ—এইরূপে জায় জায়, কতবাক্য বলা যায়, বলিলেন লক্ষ্মণ বণিতা।

পাছ্—(হায় হায় বলিলেন লক্ষ্মণ বণিতা)

আগ—শুনগো জানকী দিদি, কিঞ্চিৎ দয়া করি যদি, বল আজি কাননের কথা। (হায় হায় বল আজি কাননের কথা)

অমনি সঙ্গে সঙ্গে বালকগণ দণ্ডায়মান হইয়া গান ধরিল ঃ—

"দিদি জানকী, বল বল তুমি জানকি ?

কেমনে জিনিলা লঙ্কা রাম কমলাখি।

কেমন সে লঙ্কার নারী, কেমন লঙ্কার অধিকারী,

কেমন নারী, মন্দোদরী সে বিধুমুখী।

এই হইতেই গানের পালা আরম্ভ হইল। এইরূপ যে কোন পালা গাইতে হইবে, তাহার সারাংশ পূর্ব্বেই প্রকাশ করিতে হইত।

এক্ষণে নকীব, ঝাড়ুদার, ভিস্তীওয়ালা, কালুয়া, ভুলুয়া, রফী প্রভৃতি আর যাত্রার দলে দেখা যায় না। গানের পালা প্রকাশ করিতে আর সুর সংযোগ পন্থ নাই। একজন অভিনেতা বক্তৃতা করিয়া তাহা প্রকাশ করেন।

তখন পালার উল্লিখিত সমুদয় ব্যক্তিকে সাজিতে হইত না। কেবল প্রধান প্রধান কয়েকটি নায়ক নায়িকারই সাজিবার ও কথা বলিবার নিয়ম ছিল। যেমন কৃষ্ণলীলায় রাধা, কৃষ্ণ, দূতী এবং আবশ্যক মত দুই একটী সখীকে সাজান হইত। রাম লীলায়, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য পালায় এইরূপ প্রধান

প্রধান তিন চারিটি নায়ক নায়িকাকে সাজিতে দেখা গিয়াছে। প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকার কথা তাহারা স্বয়ং বলিত, অন্যান্যের কথা দলের অন্যান্য ব্যক্তি বলিতেন। রাজা, রাণী ও মন্ত্রী প্রভৃতির কথা গুলি অধিকারী মহাশয় স্বয়ংই প্রকাশ করিতেন। দলের অধিকারী ধূতি চাপকান পরিয়া বেহালা হস্তে বালকদিগের পশ্চাতে থাকিতেন, এবং আবশ্যক মত বক্তৃতা করিতেন। কোন কোন অধিকারী বালকদের গান সকল ধরিয়া দিতেন।

এক্ষণে আর সে প্রণালী নাই। অধিকারী মহাশয়ের আর রাজা, রাণী ও মন্ত্রীর কথা বলিবার নিয়ম নাই। পালার উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সাজিতে এবং যাহার যে কথা তাহা তাহার স্বয়ংই বলিতে হয়।

পূর্ব্বে বক্তৃতার আড়ম্বর ছিল না। বক্তৃতা অপেক্ষা গানের ভাগ অধিক ছিল। দুই চারি কথাতেই বক্তৃতা শেষ হইত। যে গানটী গাইতে হইবে তাহার প্রথম চরণের কথকটা কথা বক্তৃতায় প্রকাশ পাইত। এবং নায়ক নায়িকাদের কথোপকথন সময় জিজ্ঞাসা করা হইত। "তবে সে কেমন" উত্তর, তবে শুন বলি। কোন কোন দলে বলা হইত, "তবে সেকথা শ্রবণে শ্রবণ কর" এই বলিলেই সেই ভাবের গান আরম্ভ হইত।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আর দুই চারি কথায় বক্তৃতা শেষ হয় না। "তবে সে কেমন? তবে শুন বলি, শ্রবণে শ্রবণ কর"

ইত্যাদি” বক্তৃতা এক্ষণে আর শুনা যায় না। হাঙ্গলা বাঙ্গালা শব্দ এক্ষণে যাত্রার দল হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে অতীব বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করা হয়। অনেক দলের বক্তাগণ গদ্য পদ্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীর করুণ ও হাস্য প্রভৃতি রসোদ্দীপক বক্তৃতা করিয়া স্বীয় পারদর্শিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের গান অপেক্ষা সে সময়ের গান গুলি বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিল। কারণ এক্ষণে যাত্রার বক্তৃতা ভিন্ন গান শ্রবণে শ্রোতাগণ কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। কেন না, এক্ষণে যাত্রার দলের গান গুলি প্রায়ই অস্পষ্ট ; গানটী গাইবার সময়ে ২।৩ জন বালক একসঙ্গে গান গাইতে আরম্ভ করায়, “গোলে হরিবোল” হইয়া গানের মর্ম্ম আদৌ বুঝিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে যাত্রার দলে জুরির নিয়ম ছিল না। এক্ষণ সকল দলেই জুড়িতে গান করার নিয়ম হইয়াছে। শ্রোতাদের দুরাদৃষ্ট বশত বালকগণের গানও যেরূপ অস্পষ্ট জুড়িদের গানেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা। গানের পদ কিছুই বোঝা যায় না। কেবল বালক ও জুরিদারদের হস্তভঙ্গী, মুখভঙ্গি মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পূর্ব্বকালে অল্প সংখ্যক বালকে গান করায় গানের পদগুলি বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে গানের ভাবে শ্রোতাদের মন দ্রবীভূত হইত। অল্পদিন হইল কোন কোন দলে দুই একটী গান একজন মাত্র ব্যক্তিতে গান করায় শ্রোতাদের কথঞ্চিৎ পরিমাণে তৃপ্তি সাধিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার উৎকর্ষ প্রযুক্ত সঙ্গীতগুলি উচ্চ আদর্শে প্রস্তুত হইতেছে। শব্দ বিন্যাস, শব্দের বিশুদ্ধতা, শব্দের অনুপ্রাস প্রভৃতি সম্মিলনে রচনার পরিপাট্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের সঙ্গীত অপেক্ষা সেই অতীত সময়ের সঙ্গীত সকলের রচনা যে বিশেষ নিম্ন স্থানীয় ছিল, একথাও স্বীকার করিতে পারি না। দৃষ্টান্ত স্থলে নিম্নে কয়েকটী সঙ্গীত উল্লেখ করা যাইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ অধিকারী, যাত্রা গানের উন্নতি বর্দ্ধন করিয়া দেশে অনির্ব্বচনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা ও বহুল সম্মান ছিল। এবং যাত্রা গান যে প্রথমে তিনিই আবিষ্কার করেন, একথাও বলা যাইতে পারে। তিনি স্বয়ং দূতী সাজিয়া গান ও ঘটকালি (বক্তৃতা) করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি পাথরের দাঁত লাগাইয়া দূতী সাজিয়া ঘটকালি করিয়াছেন। তাঁহার ঘটকালি সর্ব্বজন-প্রশংসনীয় ছিল।

পাঁচালি-প্রণেতা স্বর্গীয় দাশরথি রায় একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি যদি বোল চালাই; গোবিন্দ গুই ঢোলক বাজায়; বকু-মিঞা বেহালা ধরে; গোবিন্দ অধিকারী ঘটকালি করে" তবে এক রাত্রিতে কলিকাতা সহরের টাকা লুটে নিতে পারি।"

গোবিন্দ অধিকারী রাধিকার মান-ভঞ্জন, কলঙ্ক-ভঞ্জন ও দূতী-সংবাদ পালা গান করিতেন। ঐ সকল পালার প্রণীত সঙ্গীতগুলির রচনার বিশেষ পারিপাট্য রহিয়াছে।

দূতী মথুরায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছে যথাঃ—

"পার কি শ্যাম আমায় চিনিতে? আমায় চিনিতে।

হরি তোমার বচন যেন, স্নিগ্ধ জল আর চিনিতেঃ।"

যখন নন্দের বাধা চিনিতে, যখন শ্রীরাধায় চিনিতে, শ্যাম হে তখন আমায় চিনিতেঃ।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নাম শ্রবণ মাত্রে শোকাকুল চিত্তে বলিলেন, সখি! আমার প্রাণেশ্বরী রাইকিশরী কেমন আছেন, তাহা সত্বর বল।

তৎশ্রবণে দূতী বাষ্পাকুল নেত্রে ও গদ গদ স্বরে বলিতেছে। "লম্পট নিরদয়, হরি দয়াময় বলে তোমায় কোন গুণেঃ। কেহ চন্দন দানে বস্‌ল সিংহাসনে; আমরা প্রাণ দানে স্থান পেলেম্ না চরণেঃ।

হলো রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী; সকলি তোমারি কৃপায়; হরি যারে রাখ পায়, সে সকলি পায়, তুমি যারে না রাখ পায়, বিপদ ঘটাও পায় পায়; হাসি পায় হে পায় ধরার দিন কি পড়ে মনে।

গোবিন্দ অধিকারী এইরূপ বহুসংখ্যক চিত্ত বিমুগ্ধকর সঙ্গীত রচনা করতঃ তাহা গান করিয়া শ্রোতা-দিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। বাহুল্য প্রযুক্ত অধিক উল্লেখ করা গেল না। গোবিন্দ অধিকারীর দলে খোল করতাল বাজাইয়া গান করা হইত।

রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীও দূতী সংবাদ পালা গাইতেন। উক্ত দলের দূতী শ্রীরাধিকারে বলিতেছে—

"ছাড়া প্রেমের গাছে কেন বেড়া দিতে যাব।"

শ্যাম ত্যাগী, প্রেম ত্যাগী আমি, ফলভোগী তার নাহি হব। এক বৃক্ষের চারি নাম, ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম; সেফলে আমারে বাম হলে বিধাতা; প্রাপ্ত নাহি যে ফল তাহে আকিঞ্চন বৃথা; তারে আকিঞ্চন করি অনর্থ কেন মান খোয়াব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রসিক রায় পূর্ব্বে বালক সঙ্গীতের দল করিয়াছিলেন। তিনি বালক সাজাইয়া, খোল করতাল বাজা-ইয়া, পরমার্থ বিষয়ক বহুল সঙ্গীত প্রস্তুত করতঃ যাত্রার দলের ন্যায় গান করিতেন। তাঁহার প্রণীত সেই মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ বিশেষ মুগ্ধ হইতেন। অদ্যাপি তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতগুলি সকলে হরিসঙ্কীর্ত্তনে বিশেষ আগ্রহের সহিত গাইয়া থাকেন। যথা—

"হরিবল বল জগাই মাধাই।
তোরা নেচে নেচে দুটি ভাই।

ওনাম মধুর বড়, ছোট বড় কারো বল্‌তে বাধা নাই।

এই হরির নামে হয়, ব্রহ্মার ব্রহ্ম ভাব উদয়, শিব ত্যজি কাশী, শ্মশান বাসী, হলেন মৃত্যুঞ্জয়; নামে যোগী জনে, বিজন বনে, মহা সুখে কাল কাটায়।

প্রহ্লাদ হরিবল বলে, পর্ব্বত অনলে জলে, করীর পদ চাপনে, বাঁচ্‌লে প্রাণে, খেয়ে গরলে; নামে ধ্রুব ধ্রুব লোকে গেল এমন নাম আর হতে নাই।

রসিক রসিক যে রসে, ওমন মজ সেই রসে, থাক দিবানিশি

মত্ত হরির নাম-সুধারসে ; এবার রসিক হতে যানা জাবে নামের গুণ গৌর নিতাই।

গোবিন্দ অধিকারীর ন্যায় আরও বহুসংখ্যক যাত্রাওয়ালা অতি সুমধুর সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতৃ-বর্গকে বিমোহিত করিতেন।

তখন যাত্রা দলের গানগুলি সাচ্চা তাল ও রাগিণীতে প্রস্তুত হইত। কিন্তু এক্ষণে আর গানে সাচ্চা রাগরাগিণী ও সাচ্চা তালের সম্পর্ক নাই। সকল গানগুলিই জঙ্গলা সুরে প্রস্তুত। এবং তালগুলি জুড়িতে পরিণত, যথা একতালার জুড়ি, আর খেমটার জুড়ি, আড়ার জুড়ি ইত্যাদি।

সে সময়ে যাত্রা গানের মধ্যে মধ্যে সং দেওয়ার নিয়ম ছিল। দলের লোকে দাড়ি গোপ লাগাইয়া চূণকালি মাখিয়া বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী, ফকীর, ফকিরিণী, পাগলা, পাগলী, বাসুদেব ইত্যাদি নানাবিধ সং সাজিয়া নানারূপ রং ঢং করিয়া শ্রোতাদিগকে হাসাইত। শ্রোতাগণও তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু এখন আর তাদৃশ সং সাজার নিয়ম নাই ; কালী চূণ ব্যবহার করা হয় না। গানের শেষ একটী মাত্র (ফার্স) দেওয়া হয়। রসিক রায়ের দলের চণ্ডে পাগলার (ফার্সটা) বিশেষ প্রশংসনীয়।

সে সময়ে পোষাকের তত আড়ম্বর ছিল না। বালিকাদের এক একখানি সাড়ী ও বালকদিগের সামান্য রকমের পেণ্টুলন, চাপকান ও একটী মকমলের টুপি ছিল। কৃষ্ণ, বলরামের ধরা চূড়া, রাখাল বেশ দেখা যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, বালক-

দিগের কোট, পেণ্টুলন, ওভার কোট, টুপি, বালিকাদিগের গাউন, ষ্টকীং এবং সমুদায় পোষাকগুলিতে সাচ্চা জড়ির কাজ।

তখন সুর সংযোগ জন্য প্রত্যেক দলেই একটী তানপুরা থাকিত। এক্ষণে তানপুরার পরিবর্ত্তে হারমণিয়ম, ফ্লুট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। সে সময়ে দলে দুইখান মাত্র বেহালা থাকিত। একখানি অধিকারীর হাতে, আর একখানি অন্য লোকের হাতে, বর্ত্তমান সময়ে দলে ৫।৬খানি বেহালা দৃষ্ট হয়।

এখনও দলে নৃত্য করিবার পদ্ধতি আছে, কিন্তু সে পূর্ব্ব-প্রণালী অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে। এবং এক্ষণে যাত্রা গান নাটকের আদর্শে সম্পাদিত হইতেছে। এক এক ছিনে এক এক রূপ সাজ, নায়ক নায়িকার পরিবর্ত্তন। বেশভূষার পরিবর্ত্তন। কিন্তু সেকালে এরূপ পদ্ধতি কিছুই ছিল না।

কবিকঙ্কন চণ্ডী।

মুকুন্দরাম-কৃত কবিকঙ্কন চণ্ডীর তখন সমাজে বিশেষ আদর ছিল। কবিকঙ্কন, শ্রীমন্তমশান যাত্রা বলিয়াও উল্লেখ হইত। লোকনাথ ধোপা কবিকঙ্কন যাত্রা গানে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কন যাত্রা প্রথমতঃ জয়ঠাকুর আবিষ্কার করেন। তিনি একদা বলিয়াছিলেন, "ঢপে রূপী, কীর্ত্তনে গুপী, রামায়ণে রাম, কবিকঙ্কনে হাম," অর্থাৎ রূপ গোস্বামী ঢপ গান-প্রণেতা; গুপী

কীর্ত্তনীয়া কর্ত্তৃক কীর্ত্তন অঙ্গ প্রচার হইয়াছিল। রাম ঠাকুর রামায়ণ গান প্রচার করেন। এবং জয় ঠাকুর কবিকঙ্কন গানের প্রকাশক।

কবিকঙ্কন যাত্রায় খুলনার পবিত্র হৃদয়ের বিশুদ্ধ পতি ভক্তির এবং শ্রীমন্তের অনুপম পিতৃভক্তির অনির্ব্বচনীয় পরিচয় প্রকাশিত রহিয়াছে। গন্ধ বণিক বংশীয় ধনপতি সদাগর বাণিজ্যার্থে সিংহলে গমন করতঃ, দেবীর অকৃপা বশতঃ দ্বাদশ বর্ষ সিংহলপতির কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। তাঁহার পুত্র ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীমন্ত সদাগর পিতার উদ্দেশে সিংহলে গমন করিয়া পিতার উদ্ধার করেন। তদুপলক্ষে সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর অপূর্ব্ব লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

যখন শ্রীমন্ত সিংহলে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন,তথন খুলন ভগবতীর উদ্দেশে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। মহামায়া তাঁহার স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া তৎক্ষণাৎ "মাভৈঃ রবে" তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। তৎশ্রবণে খুলনা প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমন্তকে দুর্গম সাগর-পথে গমনের অনুমতি প্রদান করেন।

শ্রীমন্ত ক্রমশঃ কালীদহে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, কালীদহের সেই গভীর সলিলে অপূর্ব্ব কমল বন এবং সেই কমল বনে একটী অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী বামকরে করীকর ধারণ করিয়া গ্রাস ও উদ্গীরণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে শ্রীমন্ত কর্ণধারকে বলিলেন, ইকি নিশার স্বপন? কর্ণধার বলিলেন, সদাগর! এ অতি অসম্ভব ঘটনা।

"কর্ণধার বলিছে গভীর বহে জল।
ইথে উপজিবে বল কেমনে কমল?"

সহসা সেই বিদ্যুৎবরণী কামিনী বিদ্যুতের ন্যায় লুক্কায়িতা হইলেন। তখন শ্রীমন্ত বলিতেছেন—

তাল আড়াঠেকা।

"এই ছিল কোথা গেল কমল-দল-বাসিনী।
লোক-লাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শশীবদনীঃ॥"
কোথা গেল সে সুন্দরী, কোথা বা লুকাল করী,
আহা,মরি কি মাধুরী, সুরাসুর মনোমোহিনীঃ॥
যেন স্থির সৌদামিনী, ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রানী
অথবা কৈলাসেশ্বরী শিবমোহিনী;
বাম করে ধরি নারী, গ্রাসে উগরে করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি, এ রমণী কার রমণীঃ॥

শ্রীমন্ত অনিমেষ নেত্রে বারবার আকাশ পানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পুনর্ব্বার সেই সুরসুন্দরী কমলবনে প্রকাশিতা হইলেন।

তৎপর শ্রীমন্ত দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া সিংহলে গমন করিলেন। এবং সিংহলে উপনীত হইয়া, সিংহলপতির সদনে এই অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে সিংহ-লাধিপ কালীদহে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সে কমল বন নাই। প্রস্ফুটিত কমল নাই, এবং সে কমলকামিনী নাই। কেবল সেই অকূল কালীদহের প্রশান্ত গর্ভে পর্ব্বতাকার তরঙ্গরাজী ভীতিপ্রদ গর্জ্জন করিয়া নিরন্তর ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইতেছে।

তথন্ সিংহল-রাজ শ্রীমন্তকে কামিনীর কথা জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীমন্ত কাতরস্বরে বলিলেন, রাজন্! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সেই স্বর্গীয়া রমণী এই কালীদহ-সলিলে বিরাজমানা ছিলেন। কিন্তু জানি না কোন্ মহাদেবী এই অমানুষিক মায়া প্রকাশ করিলেন।

তাল আড়াঠেকা।

"এই কালীদহে বামা শতদলে বসেছিল।
না জানি কেমন মেয়ে, কিবা লীলা প্রকাশিল?
একে নারী চঞ্চলা, বসিয়াছিলে একলা,
না জানি সে মেঘমালা, কোন মেঘে লুকাইল।

সিংহলপতি ক্রোধান্ধ হইয়া শ্রীমন্তকে দক্ষিণ মশানে বধ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। কোটাল শ্রীমন্তকে দক্ষিণ মশানে লইয়া গেলে, দেবীভক্ত শ্রীমন্ত ভগবতীর উদ্দেশে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। এবং ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন।

তাল আড়াঠেকা।

বিদেশে আসিয়া আমার প্রাণ গেল গো ত্রিনয়না।
আমি যদি মরি মাগো দুর্গার নাম আর কেউ লবে না॥
এমা! যাত্রা কল্লেম দুর্গা বলে, সুযাত্রায় কুযাত্রা হলে,
অকলঙ্ক দুর্গা নামে কলঙ্ক হলো ঘোষণা॥
এমা! এসে কালীদহের জলে, দেখা দিলা শতদলে,
পুন কোথা লুকাইলে আমারে করি ছলনা।

শ্রীমন্তের এই করুণ রোদন ধ্বনি, অচিরাৎ কৈলাসবাসিনীর

রত্ন-সিংহাসন প্রান্তে উপনীত হইল। দেবীর অটল সিংহাসন আজ টলিয়া উঠিল। মহাদেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রশান্ত দয়ার জলধি একাবারে উথলিয়া উঠিল। ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ থরথরি কম্পিত হইতে লাগিল। ত্রিনয়নার ত্রিনেত্র হইতে নভস্পর্শী দাবানল সদৃশ ক্রোধাগ্নি নির্গত হইয়া শত সহস্র অযুত শিখা ধারণ করিল। মহিষমর্দ্দিনী যে মূর্ত্তি ধারণ করতঃ মহিষাসুর দৈত্যকে নিধন করিয়াছিলেন, সিংহল-পতিকে সংহার জন্য আজ সেই দেব-দৈত্য-নর ত্রাস সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শেল, শূল, শক্তি, চক্র, ভীমতম গদা ও তীক্ষ্ণ কুঠার প্রভৃতি দশবিধ অস্ত্র, দেবীর দশ করে শোভা পাইতে লাগিল। সিংহবাহিনী সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্রোধভরে সঙ্গিনী দলকে রণ সজ্জায় সজ্জিতা হইতে আদেশ দিলেন। দেবীর আজ্ঞা প্রাপ্তে অসংখ্য ডাকিনী, যোগিনী, সংঙ্খিনী ও প্রেতিনী-গণ সশস্ত্রে রণ সজ্জায় সজ্জিতা হইল। রণোন্মত্তা ভৈরবীগণের বিকট হাস্যে, গভীর গর্জ্জনে ও পদভরে বসুন্ধরা টলটলায়মানা। ত্রিভুবন কম্পিত, দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ শশব্যস্ত, ত্রিজগৎবাসী মৃত প্রায়; ভূলোক, দ্যুলোক, নাগলোক সঘনে আন্দোলিত। মুহুমুহু উল্কাপাত, মুহুর্মুহু ভূকম্পন, যোগীগণের যোগ ভঙ্গ, গর্ভিণীর গর্ভপাত, অমরবৃন্দ স্থানভ্রষ্ট, নাগশ্রেষ্ঠ বাসুকির প্রশস্ত ফণা সঙ্কুচিত। সহসা প্রলয়কাল উপ-স্থিত হইল। তদ্দর্শনে সমস্ত দেবতাগণ সম্মিলিত হইয়া, ব্যাকুল-চিত্তে ও করযোড়ে মহাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

তখন দয়াময়ী দেবগণের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া রণ-শয্যা পরিত্যাগ করতঃ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে সিংহলে উপনীতা হইলেন। শুভ্র কেশ, লোলিত চর্ম্ম, গলিত মাংস, কোটরস্থিত অক্ষিদ্বয়, বক্র দেহ। মহাদেবী যষ্ঠি ভর দিয়া ভগ্নস্বরে "কৈরে ছিরে কোথায়" বলিয়া ঘাতকগণের হস্ত হইতে শ্রীমন্তকে সজোরে আকর্ষণ করতঃ স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

"এমা শ্রীমন্তে দক্ষিণে মসানে, উদ্ধারিলা নিজগুণে হ'য়ে, গোমা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী"

ঘাতকগণ এই ভীষণ ব্যাপার দর্শনে চতুর্দ্দিক হইতে বৃদ্ধাকে আক্রমণ করিল। এবং বৃদ্ধার নেত্রানলে অসংখ্য সৈন্য সেনাপতি তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া গেল। সিংহলপতি বৃদ্ধার এই অলৌকিক কার্য্য শ্রবণে দক্ষিণ মসানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, দশভুজা শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। তখন সিংহলাধিপ দেবীর পদতলে নিপতিত হইয়া এবং নানাবিধ স্তব করতঃ দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া অবিলম্বে ধনপতিকে মুক্ত করতঃ শ্রীমন্তকে স্বীয় দুহিতা সমর্পণ করিলেন।

বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন যাত্রার দলে শ্রীমন্তমসান পালা গাইয়া থাকে, কিন্তু গানগুলি নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে।

স্বপ্নবিলাস।

তখন জিলা ঢাকা, জনৈক সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ গোস্বামী মহাশয় স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী ও বিচিত্র-বিলাস, এই তিনটী পালা প্রস্তুত করেন। সঙ্গীতগুলির রচনার পারিপাট্য এবং সুর ও লয় যৎপরনাস্তি চিত্ত-বিমুগ্ধকর ছিল। পালার অধিকাংশ গান শ্রবণে শ্রোতাগণ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সাচ্চা তাল ও রাগ রাগিণীতে গান সকল প্রস্তুত হইয়াছিল। বিশেষতঃ একটী গানের মধ্যে ৩।৪টী সুর ও তাল এবং শব্দের অনুপ্রাস সন্নিবেশিত করিয়া প্রণেতা স্বীয় রচনা-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন ! বিক্রমপুর-নিবাসী মহাভারত কীর্ত্তনিয়া এবং জিলা ফরিদপুরের রামকৃষ্ণ সানকার এবং অন্যান্য বহুল ব্যক্তি দল করিয়া খোল করতাল বাজাইয়া উক্ত পালা তিনটী যাত্রাগানের পালার ন্যায় গান করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত পালার গান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্বপ্নবিলাস পালার একটী গান নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তি স্বপ্নে দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নন্দকে বলিতেছেন—

"ওহে ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়া গোপাল কোথা লুকালেঃ।

দেখ্‌লাম সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরে কান্দে ; জননী দে ননি দে ননি বলেঃ।

অভিমানে বাছা ধূলাতে ধূসর, বিধুমুখে বাছার কতই

মধুস্বর, ফুফরিয়া কান্দে মা বলে ; যত বাছা কান্দে বলে সর সর, আমি অভাগিনী বলি সর সর ; নাহি অবসর, কেবা দেবে সর, অম্নি সর সর বলে ফেলিলাম ঠেলেঃ।

ধূল ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ, অঞ্চলে মুছায়ে চাঁদের বদনচাঁদ, পূর্ণ চাঁদ কান্দে চাঁদ বলে ; যে চাঁদের নিছুনি কোটি কোটি চাঁদ, সে কেনে কান্দিবে বলে চাঁদ চাঁদ ; দেখ্‌লাম চাঁদের মাঝে সেই অকলঙ্ক চাঁদ ; কত চাঁদ আছে তার চরণ তলেঃ।"

বিচিত্র-বিলাস পালায়, শ্রীকৃষ্ণের বংশী উল্লেখ করিয়া দূতী বলিতেছেঃ।

"বাঁশি ভাসায়ে দিব জলেঃ। দেখ্‌বো আজি শ্যামের বাঁশী, শ্যাম বলে কি রাধা বলেঃ। যদি বলে রাধার নাম, কেটে কর্‌বো শতখান ; যদি বলে কৃষ্ণের নাম, তবে রাখিব হৃদয়ে তুলে॥"

রাই-উন্মাদিনী পালায়, শ্রীরাধা সখীদিগকে বলিতেছেন—

"কল্লিকি বিশখা, একবার এনে দেখা, মলেম মলেম প্রাণে না হেরিয়া বাঁকা। আমিত জানিনা, প্রেম তোরাত শিখালি, সরল প্রাণে মোর গরল নিশাইলি ; দেখে চিত্রপটে, যমুনার নিকটে, মোহন চূড়াধারী সে ত্রিভঙ্গ বাঁকা।"

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা।

তখন সমাজে 'বিদ্যাসুন্দর' গানের বিশেষ আদর ছিল। গোপ্‌লা উড়ে বিদ্যাসুন্দর গান গাইয়া দেশে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়া গিয়াছে। তাহার অভাবে তাহার পুত্রেরাও বিদ্যা-

সুন্দর গান গাইয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিত। তৎব্যতীত দেশের অন্যান্য ব্যক্তিগণেরও বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল দেখা যাইত। বিদ্যাসুন্দর গানেও যাত্রা গানের ন্যায় নায়ক নায়িকা সাজানের নিয়ম ছিল। এবং কথোপকথনের প্রণালীও দৃষ্ট হইত। বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী, রাজা, রাণী, কোতাল প্রভৃতি সাজিয়া বক্তৃতা ও গান করিত। বিদ্যাসুন্দর গান প্রথমত গোপ্‌লা উড়ে দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। গানের তাল গুলি পৃথক ভাবে প্রস্তুত। কাটা আর খেমটা, কাটা গড় খেমটা ইত্যাদি। গান গুলির রচনা অতীব প্রশংসনীয়। এবং সুর সকলও সুমধুর। অধিকাংশ গান গুলির রচনায় আদি রসের ছড়াছড়ী। বিশুদ্ধ ভাবের কয়েকটী গান নিম্নে উল্লেখ করা গেল। মালিনী বিদ্যাকে বলিতেছে।

১। "কথা শুনে লাজে মরে যাই ; মরি একিরে বালাই ॥
ঠাকুর জামাই হবে নাকি, সন্ন্যাসী গোসাঞী ॥
করেছিলে যেমন পণ, সুখে কর কাল যাপন,
মিলেছে অমূল্য রতন, অঙ্গে মাখে ছাই ॥

মালিনী কোটাল কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া মহারাজাকে বলিতেছে—"অবিচার করনা, কেন বিনা দোষে দেও লাঞ্ছনা। সুজন কুজন জান্‌বো কিসে, মহারাজা! মহারাজা! গায়ে কিছু নাই নিশানা।

আমি নারি বুঝতে নারি এ ছলনা, মহারাজা তপ্ত ঘর জলে পোড়েনা ॥"

উক্ত গান গুলির মধ্যে আদিরস-পরিশূন্য কয়েকটী গান সংগ্রহ করা গেল। বিদ্যাসুন্দরের প্রকৃত ঘটনা ভারতচন্দ্রের প্রণীত বিদ্যাসুন্দরেই প্রকাশ আছে এবং বঙ্গবাসীর বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা অজ্ঞাত নাই। সুতরাং তৎবিস্তারিত বৃত্তান্ত অত্র পুস্তকে উল্লেখ করা গেল না। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যাসুন্দর গানের তাদৃশ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঢপ গান।

রূপ গোস্বামী প্রথমত ঢপ গান প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মধুসূদন কান, ঢপ গানের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তিনি ঢপ গান সম্বন্ধে কয়েকটী পালা প্রস্তুত করিয়া সমাজে গান করিতেন। যথা অক্রুহরণ, শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন, মান-ভঞ্জন, প্রভায-যজ্ঞ ইত্যাদি।

মধুসূদন বহুল সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত গানের সুর ও পদ বিন্যাস বিশেষ প্রশংসনীয়। মধুর সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে তখন সমাজের ব্যক্তিগণ বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। অদ্যাপিও মধুসূদনের সঙ্গীত গুলি প্রত্যেক ব্যক্তি অতীব উৎসাহের সহিত শ্রবণ করতঃ বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। তাহার প্রত্যেক গানেই তাহার নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নাম প্রকাশ না করিয়া কেবল 'সূদন' বলিয়া নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তজ্জন্য কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আপনি মধুসূদন না বলিয়া কেবল সূদন বলিয়া নামের পরিচয় প্রদান করেন কেন? তাহাতে মধুসূদন উত্তর করেন "মধুত আমার মুখেই আছে, সূদন বলিলেই যথেষ্ট।"

জনপ্রবাদ মধুসূদন লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না,

এবং অতি হীন-বংশ-সমুদ্ভূব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৈব শক্তি বিশেষ বলবতী ছিল। তজ্জন্য তিনি বহুল চিত্তবিমুগ্ধকর সঙ্গীত প্রণয়ন করতঃ অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভয়ানক মদ্যপায়ী ছিলেন। এমন কি, অধিকাংশ সময়ই অজ্ঞান অবস্থায় থাকিতেন। যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেন, তখন অনর্গল সঙ্গীতের পদ সকল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার বেতনভোগী দুইজন শিক্ষিত ব্যক্তি তখন ঐ সকল গান গুলি লিখিয়া লইতেন।

কেহ কেহ বলেন, মধুসূদন বাল্যকালে মোহন চাঁদ নামে জনৈক সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তির নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। যে সমস্ত সঙ্গীতগুলি মধুসূদনের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার সমুদয়ই মোহন চাঁদের প্রণীত; মোহনের মৃত্যুর পর মধুসূদন যে স্থানে "মোহন বলে" সেই স্থানে "সূদন বলে" সংযোগ করতঃ স্বীয় নামে সঙ্গীত গুলি প্রকাশ করিলেন। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন দলে গান করিবার সময়ে "মোহন বলে" এইরূপ প্রকাশ করিতে শুনা যায়। যাহা হউক, কোন্ জনরব সত্য, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কিন্তু বঙ্গীয় প্রত্যেক ব্যক্তিই ঢপ গান মধুসূদনের প্রণীত, একথা একবাক্যে স্বীকার করেন।

মধুসূদনের লোকান্তরে, তাহার ভাগ্নী গুণমণি, বিদেশিনী, বামা ও তাঁহার ভাগ্নীর কন্যা ভুবনমোহিনী এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঢপ গান করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ঢপ

গানের বিশেষ আলোচনা নাই। একটী সঙ্গীত নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে আরোহণ করিয়া মথুরায় গমন সময়ে সখীগণ শ্রীরাধাকে বলিতেছে।

তাল—কয়ালি।

"বুঝি হরি যায় (হায়)
ভেবেছিলাম যায় বা না যায়; ঐ শুন রাই ভেরী বাজায়, বুঝি প্রাণ বা যায়।
বৃন্দাবন পরিত্যাজ্য, করবে না তার ছিল ধার্য্য, সে কথা করি অগ্রাহ্য, এখন কেন বা যায়।
দেখ্‌বি যদি জন্মের মত, চল গো প্যারী চল, ফুরাল বল কিরবি বল, আর কি আছে বল; যার জন্যে সকলে বলে, সে তোমায় আজ যায় না বলে, দেখনা ছুটো কয়ে বলে, কি বলে সে যায়।
কান্দিলে কি হয় বল্লে কি হয়, একবার যেতে হয়, কেউ ধরিব রথ চক্র কেউ ধরিব হয়; সূদন বলে কান্দলে কি হয়, না থাক্‌লে হয় ধর্‌লে কি হয়; প্রভাসে মিলন পুনরায় যদি প্যারী যায়॥

পাঁচালী।

তখন স্বর্গীয় দাশরথি রায় প্রণীত পাঁচালী গানের সমাজে বিশেষ আলোচনা ও আদর ছিল। দাশরথি রায় স্বয়ং পাঁচালি

গান করিতেন। এবং তিনি পাঁচালি গান খণ্ডে খণ্ডে প্রস্তুত করতঃ অষ্টম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং নানাবিধ পালা প্রস্তুত করেন। যথা কাশি খণ্ড, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমি, শ্রীরামচন্দ্রের দেশে আগমন, অক্রুর হরণ, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, খেউর বিরহ ইত্যাদি।

তাঁহার প্রণীত পাঁচালির কোন কোন খণ্ড পাঠ করিলে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব শান্তিরসের উদ্রেক হইয়া, তাঁহাকে সাধক-চূড়ামণি বলিয়া শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করা যায়। পক্ষান্তরে তাঁহার রচিত, খেউর, বিরহ প্রভৃতি পালাগুলি পাঠ করিলে তাঁহাকে বাচালের শিরোমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ মহাত্মা দাশরথি রায়ের প্রণীত সঙ্গীতগুলি আলোচনা করিলে হৃদয়ে প্রেমভক্তির অনন্ত উৎস উচ্ছলিত হইতে থাকে। এবং তাঁহার পাঁচালির রচনাও বিশেষ প্রসংশনীয়।

মনস্বী দাশরথি রায়ের পরলোক গমনের পর, তাঁহার ভ্রাতা তিনু রায় ও তৎপর দেশের অন্যান্য ব্যক্তিগণ পাঁচালির দল বান্ধিয়া দাশরথি রায়কৃত পাঁচালি গান করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে পাঁচালী গান বিলুপ্তপ্রায়।

দাশরথি রায় প্রণীত শান্তি-রসাত্মক কয়েক খণ্ড পাঁচালী হইতে কয়েকটী গান ও কিয়ৎপরিমাণে রচনা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার রচনা-শক্তির প্রমাণ প্রদর্শন করা হইল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমি পালাতে—

"অতএব সাধুজন, দিয়ে মিথ্যা কথায় বিসর্জ্জন, হও সবে

দ্বিজ প্রেমের বশ। শ্রবণ কর দ্বিজ মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবতত্ত্ব, শুক মুখে গলিত সুধারসঃ।

"মম মানস সদা ভজ, দ্বিজচরণ পঙ্কজ, দ্বিজরাজ করিলে দয়া, বামনে ধরে দ্বিজরাজ ॥

হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য কি তার জানে বিধি, সে রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণের পদরজ ॥

গমন হলে দ্বিজরাজে, নথরে দ্বিজরাজ সাজে, দ্বিজরাজ পদ শোভিত কমলার হৃদিসরোজে; এমনও দ্বিজের পদে, বঞ্চিত হলেম পদে পদে, দাস না হয়ে দাশরথি, দুঃখ পায় সে দোষ নিজ ॥

অন্যস্থলে—

শ্রবণ কর মহাশয়, আশ্চর্য্য এক বিষয়, তখন পুণ্যবান্ সমুদয়, এক পাপী কংস মথুরাতে ছিল। তার ভার না পেরে ধর্ত্তে, ধরণী যান নালিশ কর্ত্তে, ভার সহ্য কোনমতে না হলো। এখন বাঙ্গলাটা করিলে অংশ, দশ হাজার জুঠেছে কংশ, অন্য দেশ অক্য কল্লে লক্ষ হতে পারে। কেমনে ভার ধরেন পৃথ্বী, পৃথ্বীর বুঝি ঘৃণা পিত্তি, লোপাপত্তি হয়েছে একবারে।

শ্রীরামচন্দ্রের দেশে আগমন পালায়; ভরদ্বাজমুনি বলিতেছেন :—

"শ্মশান ভবনে ভব যায় ভাবে। পাব ভবের ধন, সে রাঘবেঃ; হবে দীনের প্রতি দীননাথের দয়া; দীনের এমন দিন কি হবে ॥ বনযাত্রাকালে একদিন মমধাম, এসেছিলেন সে যে গুণের গুণধাম,

আবার দয়া করে আসবেন কি রাম এমন দয়া কি সম্ভবে; তবে যদি করি নির্গুণে নিস্তার, স্বগুণে গুণসিন্ধু অবতার, দাশরথি বিনা দাশরথির ভার কে আর লবে ॥

কীর্ত্তন।

সে সময়ে সমাজে কীর্ত্তন গান বিশেষ আদরনীয় ছিল, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ কীর্ত্তন গান শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তখন শান্তিপুরের গোস্বামী মহোদয়গণ খোল করতাল বাজাইয়া সুমধুর কণ্ঠস্বর সংমিলনে রাধা কৃষ্ণের অপূর্ব্ব ব্রজলীলা কীর্ত্তন করিয়া বঙ্গদেশ মাতাইয়াছেন।

জয়দেব প্রণীত গীতগোবিন্দ গ্রন্থোল্লেখিত পদাবলী সংকীর্ত্তনে আলোচিত হইত। সুতরাং সঙ্গীতগুলি সংস্কৃত ও হিন্দি বিমিশ্রিত ভাষায় প্রস্তুত ছিল।

কীর্ত্তনে, রাধার মানভঞ্জন, বিচ্ছেদ, দশম দশা, প্রেমোচ্ছ্বাস, দূতীসংবাদ, প্রভাস যজ্ঞ প্রভৃতি পালার আলোচনা হইত। শ্রীরাধার মানভঞ্জন পালাতে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বলিতেছেন।

"তুঁহি যদি সুন্দরী, মম মুখ না হেরবি রাই,

অন্যস্থলে

"বদসি যদি কিঞ্চিৎ ওগো মানময়ী রাধিকে।

অন্যস্থলে

রাধে! দেহী পদপল্লবমুদারং।

নিভৃত নিকুঞ্জ কাননে শ্রীরাধিকা প্রেমোন্মত্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেনঃ—

"নিকরুণ মাধব, শুনহে মুরলীধর, নিবেদন করি রাঙ্গা পায়।
দাসী কিনা বলে নাথ; নিজদাসী শ্রীচরণে।
বলরামের আগে আগে, যাওহে বেণু বাজাইয়া, আমি তখন।
আঙ্গিনায় দাঁড়ায়ে।
কথা কইতে যে পেলেম না; দাদা বলরাম যে সঙ্গে ছিল।
বিজন বিপিনে বসি, রাধে বলে বাজাও বাঁশি,
ধুমার ছলনা করে কান্দি।
দুঃখ কারে বা বল্‌বো নাথ, ননদী সাপিনী ঘরে। ইত্যাদি

রাধিকা কৃষ্ণ বিচ্ছেদে কাতরা হইয়া সখীদিগকে বলিতেছেন।—

"সখীরে! এই না সেই মাধবী!
আমার মাধব নাই, মাধবী আছে গো।

নারদমুনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বৃন্দাবনের সংবাদ বলিতেছেন—

তাল—লোভা।

"দশা দেখে যে এলেম শ্যাম, অসময় যমুনায়
তরঙ্গ বাড়িল হে।
দেখ্‌লেম সব সখীর নয়ন জলে; ও সেই যমুনা
উজান চলে।
ও সেই ছিদাম সুদাম রাখালগণে; সবে পড়ে আছে
ধরা সনে।

"যখন যমুনা পার হয়ে এলেম ; তখন রাই মলো রব শুন্তে পেলেম।

রামায়ণ।

রামঠাকুর রামায়ণ গানের সৃষ্টিকর্ত্তা। তখন রামায়ণ গান শ্রবণে সমাজের লোকের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। কোন বাটীতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মৃত্যুর অল্পদিন পরেই রামায়ণ গান দেওয়া হইত। তদ্ভিন্ন অধিকাংশ সময়েই প্রত্যেক বাড়ী রামায়ণ গান হইতে দেখা গিয়াছে। সকলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সুধা সম রাম নাম শ্রবণ করিতেন।

রামায়ণ গানে, রাম বনবাস, সীতা বনবাস, রাবণ বধ, লব কুশের যুদ্ধ, ইন্দ্রজিতা, মহিরাবণ বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, প্রভৃতি পালা আলোচিত হইত। সমাজের বর্ণ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় বহুল ব্যক্তি রামায়ণের দল বান্ধিয়া গান করিতেন। মূল গায়ক বামহস্তে চোমর, দক্ষিণ হস্তে মন্দিরা (জুড়ি) পায় নুপুর, ধূতি, চাপকান ও পাগড়ি মাথায় বান্ধিয়া নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গীত করিতেন। পাছ দোহারেরা ধুতি পড়িয়া চাদর কান্ধে, নুপুর পায় দিয়া মন্দিরা বাজাইয়া গানের তালে তালে নৃত্য করিয়া গান ধরিতেন। কোন কোন দলে খোল করতাল দেখা যাইত। কালের পরিবর্ত্তনানুসারে ক্রমশঃ গানের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় রামায়ণের দলেও যাত্রার দলের আদর্শ প্রবেশ করিল। এবং রামায়ণের দলেও যাত্রার দলের ন্যায় বালক বালিকা সাজান ও

কথঞ্চিৎ বক্তৃতার প্রথা প্রচারিত হইল। ঢোলক বেহালা ও তানপুরা দেখা দিল। বস্তুতঃ রামায়ণ গান অতীব শান্তি রসাত্মক ও শ্রুতিমধুর। নিম্নে কয়েকটী গান উদ্ধৃত করা গেল।

রাবণবধ পালায় রাবণ অন্তিম সময়ে শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।—

"প্রাণত অস্ত হলো আজ আমার ; কোমল আঁখি। একবার হৃদকমলে দাঁড়াও দেখি॥ অহিকের ঐশ্বর্য্য করা রাম কিছু মোর নাইহে বাকী ; এখন পরকালের বন্ধু হলে যম রাজাকে দিতাম ফাঁকি॥ ইন্দ্র আনি হার যোগাত, যমকে অশ্ব শালে রাখি ; এখন কাল পেয়ে কাল বেটা ধরে ঐ ভয়ে রাম তোমায় ডাকি।

লবকুশের যুদ্ধ পালায় রামচন্দ্র লবকুশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে লবকুশ রামচন্দ্রকে বলিতেছে।

"পরিচয় কি দিব হে, রাম, তোমাকে (ওহে ও রঘুবর) আমরা দুটী ভাই কাননে বেড়াই, বনফল খাই, মনের কৌতুকে॥

পিতার নাম মোরা কর্ণে নাহি শুনি, মায়ের নাম জানকী, জনকনন্দিনী, তিনি জনমদুঃখিনী ; মায়ের সতত নিরখি, ঝরে দুটি আঁখি, বলেন, কোথা কমলাখি দেখা দাও দাসীকে।"

রামচন্দ্র লবকুশকে সন্তান বলিয়া সম্বোধন করায় লব কুশ বলিতেছে।

"তোমার সন্তানে কেন এত অভিলাষ, (ওহে ও রঘুবর) অযোধ্যার রাজা তুমি রঘুনাথ, তোমায় লোকে কয় সীতাপতি

সীতানাথ, তুমি সে সীতে, কাট্‌লে অসিতে, বিনা দোষেতে দিলা সীতায় বনবাস ॥"

লবকুশ হনুমানকে লতাদ্বারা বন্ধন করিলে, হনুমান মনে মনে বলিতেছেঃ —

"কার সাধ্য আমায় বান্ধে ॥ সিন্ধু রয় কি বালির বান্ধে, ভবের বন্ধন মুক্ত কারণ, আমি বান্ধা রামজানকীর পদে ॥

এড়াইতে চিন্তার্ণব, সেই চিন্তামণির চরণ ভাব, চিন্তা কি ভাই কুশি লব, আমি বান্ধা দিলাম মনের সাধে ॥"

বর্ত্তমান সময়ে রামায়ণ গানের প্রতি নব্য-সম্প্রদায়ের আর ততদূর শ্রদ্ধা ভক্তি নাই।

পদ্মপুরাণ।

তৎকালে দেশে পদ্মপুরাণ গানের বিশেষ আদর ছিল। কেহ কেহ পদ্মপুরাণ গানকে (রয়ানী) বলিয়া উল্লেখ করিতেন। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মনসা পূজা উপলক্ষে অনেক জমিদার-বাড়ীতে রয়ানী গান হইত। তৎভিন্ন অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আড়াই দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন পর্য্যন্ত রয়ানী গান শ্রবণ করিয়াছেন। কেহ কেহ কোন কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে মনসা পূজা ও রয়ানী গান মানসা করিতেন।

মনসা পূজা উপলক্ষে, মনসা, লখিন্দর, বেহুলা, চাঁদবেণে, নেতা ধোপানী ও বর্ষা গোদা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ অতি সমারোহে পূজা করা হইত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রয়ানী গান দেওয়া হইত।

দেশের বহু ব্যক্তির রয়ানী গানের দল ছিল, গানের সময় খোল করতাল বাজান হইত। মূল গায়ক চামর হস্তে নুপুর পায় দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গান করিতেন। পাছু দোহারেরা ধূয়া ধরিত। কিন্তু রয়ানী গানগুলি অতি উচ্চ আদর্শে প্রস্তুত ছিল। সাচ্চা তাল ও সাচ্চা রাগিণী এবং অনেক গানে, একটী গানের মধ্যে দুই তিনটী তাল সংযোজিত দৃষ্ট হইত।

ক্রমশঃ রয়ানী গানেও যাত্রার ছায়া পড়ায় লখিন্দর, বেহুলা, চাঁদবেণে সাজাইয়া, বেহালা ঢোলক বাজাইয়া গান করার নিয়ম

প্রচলিত হইল। এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বক্তৃতার ছায়াও প্রকাশ পাইল। কিন্তু দেশের লোকের রুচির অভাব প্রযুক্ত আজকাল রয়ানী গান প্রায় প্রচলিত নাই।

পদ্মপুরাণ গানের মূল বৃত্তান্ত এই :—

অতি প্রাচীন সময়ে গন্ধ বণিকবংশীয় অতি ধনাঢ্য সওদাগর, চাঁদ বণিক চম্পাইনগরে বাস করিতেন। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। কিন্তু মনসাদেবীর সহিত তাঁহার চির বিসম্বাদ প্রচলিত ছিল। লোকে কথায় বলে, "যেন চাঁদ মনসার বিবাদ" এবং মনসা ভাসান পাঁচালিতেও উল্লেখ আছে।

"চম্পকনগরে ঘর চাঁদ সদাগর।
মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর।

মনসা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি ছলে, বলে, কৌশলে যেরূপেই হউক, চাঁদ বেণের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিব। তৎশ্রবণে চাঁদ বেণেও প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি প্রাণান্তেও মনসার পূজা করিব না।

"যদি আমার প্রাণ যায়, তথাপি না দিব জবা মনসার পায়।"

অন্যস্থলে—

"যে হাতে পূজিব আমি দেব শূলপাণি,সেই হাতে পূজিব আমি বেঙখেকো কাণি।

এই উপলক্ষে উভয়ের বিবাদ এবং পদ্মপুরাণের সৃষ্টি। মনসা দেবী চাঁদর নিকটে পূজাগ্রহণ জন্য নানারূপ চেষ্টা ও চাঁদ সদাগরের যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। এমন কি,

মনসা ক্রমশঃ চাঁদর ৬টী পুত্রের প্রাণনাশ করিলেন কিন্তু তথাপি সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাঁদর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। পরিশেষে তিনি বাণিজ্য করিয়া প্রচুর পণ্যদ্রব্য চৌদ্দ ডিঙ্গা পরিপূর্ণ করতঃ দ্বাদশ বৎসর অন্তে গৃহে আসিতেছেন, সেই সময়ে দেবী মনসা তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য কুচক্র উদ্ভাবন করিলেন।

তরণীচয় মগরাদহে উপনীত হইলে সহসা গগনমণ্ডলে ঘনঘটা উপস্থিত হইয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি এবং মুহুর্মুহু অশনিসম্পাত আরম্ভ হইল। মগরাদহের ঘূর্ণিত সলিলরাশি প্রবল সমীরণভরে সমধিক ভীষণত্ব ধারণ করিল। যেন অসংখ্য বিচিকুল উল্লম্ফনে অসীম গগন স্পর্শ করিতে ধাবিত হইতেছে। জলরাশির ভীষণ কল্লোলে বসুন্ধরা শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এবং সেই প্রবল বাতাস তরঙ্গে ভীম আঘাতে তরণীচয় ভগ্ন হইয়া অচিরাৎ জলমগ্ন হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গে চাঁদ সদাগর মগরাদহের গভীর জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ব্যাকুল-চিত্তে সেই দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

রাগিণী বেহাগ।

তাল—আড়াঠেকা।

এবিপদে কোথা রলে ভবকর্ণধার।

শঙ্কটে পড়িয়া ডাকি করগো উদ্ধার।

কোথা রলে, হে শঙ্কর ! সংকট সংহর হর, আমি যদি প্রাণে মরি কলঙ্ক তোমার।

ভক্তের করুণ-রোদন শ্রবণে ভক্তবৎসল ভোলানাথের দয়ার উদ্রেক হইল। এবং আশুতোষ তৎক্ষণাৎ নন্দীকে প্রেরণকরতঃ চাঁদকে সেই উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

তৎপর মনসা চাঁদসদাগরের পুত্র লখিন্দরের বিবাহের রজনীতে কালনাগিণী নামে এক বৃহৎ সর্পদ্বারা দংশন করাইয়া প্রাণসংহার করিলেন। লখীন্দর-পত্নী-সাধ্বী বেহুলা, স্বামীর মৃতদেহ লইয়া ভেলায় ভাসায়মানা হইয়া, সেই দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা জগতে পতিব্রতা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত সতীকূলের উচ্চ আসন গ্রহণ করিলেন।

সতীপ্রধানা বেহুলা পতির মৃতদেহ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত অকূলসমুদ্র-বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর সেই দুর্ল্লঙ্ঘ্য ও বিপদ-সঙ্কুল সমুদ্রপথ লঙ্ঘন করতঃ ত্রিদশভবনে উপনীতা হইয়া দেবসভায় নৃত্য গীত আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীত-প্রিয় পশুপতি সেই বালাকণ্ঠ-বিনির্গত সুধাময় সঙ্গীত-শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া, বেহুলাকে বরপ্রদান করিলেন "অয়ী বালে! জন্মায়ুস্তি ভব।"

তৎশ্রবণে বেহুলা ভোলানাথের পদতলে নিপতিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে বলিলেন, প্রভো! আমি বাল-বিধবা, আজীবন দুঃসহ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। দেব! ভবদীয় বাক্য অলঙ্ঘনীয়। ভগবন! দাসীর প্রতি প্রসন্ন হউন। হে পশুপতে! হে ভবানীপতে! কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া এই চিরদুঃখিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

তখন সর্ব্বান্তর্য্যামি মহাদেব আমূল বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া মনসাকে বলিলেন, পদ্মে! চাঁদ সদাগরের প্রতি প্রসন্ন হও, আমার অনুরোধ রক্ষা কর, বৎস্যে! এই বালিকার দুঃসহ দুঃখ দর্শন করিয়া তোমার হৃদয়ে কি দয়ার সঞ্চার হয় না? মাতঃ, অবিলম্বে লখিন্দরের জীবন দান কর।

এই ব্রহ্মাণ্ডে কাহার সাধ্য আছে যে,সেই ভূতভাবন ভবানীপতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে? মনসা তৎক্ষণাৎ লখিন্দরের প্রাণ দান করতঃ চাঁদ কর্ত্তৃক ষোড়শোপচারে পূজা প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ লাভ করিলেন।

ভাসান যাত্রা।

প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর গত হইল, ভাসান যাত্রা গান প্রচারিত রিত হয়। ভাসান যাত্রা পদ্মপুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তখন গ্রামে গ্রামে ভাসান যাত্রার দল সৃষ্টি হইল। জিলা যশোহরের মবারক মোল্লা, বসন্ত ধোপা প্রভৃতি ব্যক্তি নানাবিধ জঙ্গলা সুর সংগ্রহ করিয়া, বহুল গান প্রস্তুত করতঃ যাত্রা গানের আদর্শে ভাসান যাত্রার পালা বাঁধিয়া সমাজে যশোলাভ করিতে লাগিল। নায়ক নায়িকা সাজাইয়া, বক্তৃতা, ডুগি তবলা, বেহেলা, জুড়ি তানপুরা ব্যবহার করিয়া গানের নাম 'ভাসান যাত্রা' প্রচার করাতে দেশের লোক গানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে

থাকিলেন। গান ও বক্তৃতাগুলি পদ্মপুরাণের বিবরণ উল্লেখে প্রস্তুত। কিন্তু কোন কোন স্থলে মূল বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত ও কোনস্থানে অতিরিক্ত ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছিল।

নানারূপ জঙ্গলা সুরে প্রস্তুত হওয়ায় গানগুলি অতীব সুশ্রাব্য হইল। এবং রচনার পরিপাট্যও নিতান্ত মন্দ ছিল না। দেশে অনেকে সখের দল প্রস্তুত করিয়া ভাসান যাত্রা গাইতে থাকিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ভাসান যাত্রা সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে ১টী গান উল্লেখ করা গেল।

নখিন্দর নিছানী নগরে একটী বাজার সংস্থাপিত করিলেন।

নখিন্দর বসাল বাজার নিছানী নগরে।
আহা মরি আশ্চর্য্য দেখতে নয়ন হরে হরেঃ।
কর সবে দোকানদারি, হয় না যেন জুয়াচুরি, যদি আসে তোলাদারি, কেউ তোলা দিওনা তারেঃ।

বাউল সঙ্গীত।

১২৮৬ সালে প্রথমতঃ বঙ্গভূমে 'বাউল সঙ্গীত' প্রচার হয়। কুমারখালি নিবাসী শ্রদ্ধেয় হরিনাথ মজুমদার মহাশয় নানাস্তরে ও তালে সারগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বহুল সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং সঙ্গীতগুলি ফিকির চাঁদ ফকিরের প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করেন। সঙ্গীতগুলির

চিত্তবিমুগ্ধকর শক্তি দর্শনে বঙ্গভূমির প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বাউল সঙ্গীতের দল দেখা দিল। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্রাভদ্র সমুদয় ব্যক্তি সঙ্গীতের দল বাঁধিয়া, মুখে দাঁড়িগোপ লাগাইয়া, আলখেল্লা পরিধান করিয়া, খোমক বাজাইয়া প্রত্যেক বাটী বাটী গান করিতেন। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহাত্মা চৈতন্য-দেব সঙ্গীগণ সহ একদিন মধুর মৃদঙ্গ বাজাইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনে বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন। বাউল সঙ্গীত গায়কগণ ও খোমক বাজাইয়া সুধাময় সঙ্গীতে বঙ্গবাসীর মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলিলেন। সহসা দেশে ভক্তিরসের প্রবল স্রোত বর্ষাকালীন নদী স্রোত সদৃশ অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেন বঙ্গদেশে স্বর্গীয় শান্তি ভাবের আবির্ভূত হইল। বস্তুতঃ গায়কগণ যখন খোমক বাজাইয়া নুপুর পায় দিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই পরমার্থ বিষয়ক এবং নানাবিধ উপদেশ-পূর্ণ সঙ্গীত গুলি গাই-তেন, তখন সত্য সত্যই শ্রোতাগণের প্রত্যেকের হৃদয়ে অনুপম শান্তিপ্রদ বৈরাগ্য ভাবের উদয় হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই বাউল সঙ্গীত দেশ হইতে এককালীন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই চিত্তবিমুগ্ধকর কয়েকটী সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

(১) এত ভালবাস বসে আড়ালে। আমি কেন্দে মরি ধরতে নারি হাত বাড়ালে। আমি কান্দি যখন ব্যাকুল হয়ে, তুমি চক্ষের জল দেও মুছাইয়ে, হায়রে, তুমি হেসে হেসে কাছে এসে, কত উপদেশ দেও বয়ে।

আমি ছিলাম যখন মার উদরে, ও সেই ঘোর অন্ধকার কারাগারে, হায়রে; তুমি আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে, প্রভু আমাকে বাঁচালে।

(২) বাঁশের দোলায় উঠে, কেহে বটে শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে।
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, নটবহরা জাত বেহারার কান্ধে ছলে।
ঘুড়িয়ে ঢাকার সহর দিল্লি লাহোর টাকা মোহর এনেছিলে;
খেতে না পয়সা সিকি, কওহে দেখি তার কি কিছু সঙ্গে নিলে।
রং বিরং শালের জুড়ি, চেইন ঘড়ি সব কোথা খুলে;
হবে যে এমন দশা, দশম দশা জীবন দশায় রলে ভুলে।
ফিকির চাদ ফকিরে কয়, এই সমুদয় দেখে শুনে লোক সকলে
একটী দিনের ভাবনা কেউ ভাবে না বৃথা কাজে আছ ভুলে।

জারিগান।

সেই মদিনার লোমহর্ষণ ঘটনা অবলম্বনে জারিগান প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন পরমার্থ ও দৈহিক বিষয় লইয়াও অনেক গান রচিত হইয়াছে। পাগলা কানাই জারিগান করিয়া সমাজে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন এবং তিনিই প্রথমতঃ জারিগান আবিষ্কার করেন। তাহার গান শ্রবণ জন্য দেশের হিন্দু মুসলমান সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। যেখানে ‘পাগলা কানাই’ গান করিতেন, সেখানে লোকে লোকারণ্য হইত। এমন কি

অনেক স্থলে লোকের গোলযোগে গান ভঙ্গ হইয়া যাইত। জারি-গানের সুর অতি সুমধুর, বিশেষতঃ মদিনার সেই ইমাম বংশের অধঃপতন সম্বন্ধীয় নিদারুণ ঘটনার আলোচনা প্রযুক্ত সঙ্গীতগুলি শ্রবণে প্রবল শোকানলে হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে থাকে। জারিগানকে 'বয়াত' গান ও মূলগায়ককে 'বয়াতি' বলে। মূল-গায়ক খঞ্জরি বাজাইয়া আগদোহারে গান করেন। পাছ দোহারেরা পাছে পাছে গান করিয়া থাকে। কোন কোন দলে বালক সাজান হয়। বালকেরা আগদোহারে গান করে।

পাগলা কানাই সেই মদিনার ঘটনা ব্যতীত অনেক স্থলে সামান্য সামান্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া নানারূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা পর-মার্থ বিষয়ক অতি সারগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ এবং ভক্তি-রসাত্মক বহুল সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অনেক সময় তিনি উপ-স্থিত মতে স্বভাব বর্ণন করিয়া সঙ্গীত প্রস্তুত করতঃ স্বীয় পার-দর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথাঃ—

"ও ভাই নারীর প্রেমে কেউ মজ না পাগলা কানাই কয়। আমি কানাই ঠেকেছিলাম ঐ প্রেমের দায়। ও ভাইরে, ভব পারের কি হবে উপায়।

"ওভাই লাঙ্গল কিনে জোয়াল কিনে পাঠালাম খেতে, চাষ করিতে, গেলাম ভাইরে শূন্যদর মাঠে; ও ভাইরে, কানাইর জমি পতিত যে রলো।

একসময় জিলা ফরিদপুর কৃষিপ্রদর্শনী মেলায় পাগলা কানাই গান করিতে আসিয়া নিম্নলিখিত গান করিয়াছিলেন।

"ওভাই ঢাকার জেলায় আমার বাড়ী পদ্মার ওপার, তাতে বহুদূরে আমার ঘর; ছোকড়াগণ নিয়ে সাতে, এলেম তিনদিনের পথে, লায়েকের বাড়ী দেখি চাঁদের বাজার। আমি এইবাড়ী একঘোড়া পাব সত্যবটে; যদি থাকে আমার ললাটে; ঘোড়ার শব্দ শুনে, এনেছি ল্যাগাম কিনে, দাবড়াব ফরিদপুরের মেলার মাঠে।

পাগলা কানাইর অভাবে, ইতু বিশ্বাস, হাকিম চাঁদ এবং অন্যান্য অনেকে বয়াতের দল করিয়া গান করিতেছেন। মুসলমানদিগের সকল পর্ব্বেই জারিগান হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে জারিগানে কবিগানের ন্যায় প্রশ্ন উত্তর দ্বারা গান করিতে দেখা যায়। তাহাতে উভয় বয়াতির ক্ষমতার তারতম্যের বিচার হইয়া থাকে।

জারিগানে হিন্দুশাস্ত্রের ও বিবিধ বিষয় লইয়া গান প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমানে জারি 'বয়াত' গানের তাদৃশ আড়ম্বর নাই।

গাজির গান।

তখন সমাজে গাজি ও কালুর মহিমা বিশেষরূপে প্রচারিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই গাজি সাহেবের প্রতি অচলা ভয় ও ভক্তি দেখা যাইত। এবং গাজির নামে সিন্নি দেওয়া হইত। অদ্যাপি সমাজের লোক গাজির সিন্নি দিয়া থাকেন। এবং নদীতে নৌকা খুলিবার সময় "পাঁচপীর গাজির বদর বদর" বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেওয়ার নিয়ম আছে।

তখন অনেক ফকিরকে গাজির নৌক মাথায় লইয়া ও গাজির আশা হাতে করিয়া বাড়ী বাড়ী ধান, চাল ও পয়সা ভিক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে। দেশের লোকে ও ভক্তি সহকারে গাজির ফকিরকে ভিক্ষা প্রদান করিতেন।

সেই সময়ে মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে অনেকে গাজির ফকির ছিলেন। তাহারা গাজির গান করিতেন। গানের আসরে গাজির আশা পুতিয়া আশা সম্মুখে রাখিয়া গান করা হইত। গাজির জীবনচরিত ও তাঁহার মহিমা বর্ণন এবং তাঁহার ক্ষমতার বৃত্তান্ত পালা বান্ধা ছিল। মূলগায়ক চোমর হস্তে; নূপুর পায় দিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই সমুদয় বিবরণ গান করিতেন। পাছ দোহারেরা তালে তালে সুর ধরিত। বর্ত্তমান সময়ে গাজির গান প্রায় শুনা যায় না। দেশে স্থানে স্থানে বহুল গাজিসাহেবের দরগা দেখা যায়।

সারিগান।

সেই সময়ে বর্ষাকালে বহুসংখ্যক ইতর শ্রেণীর লোকে নৌকা বাইছ দিয়া সারি গান করিতে করিতে মহা আমোদ প্রকাশ করিত। নদীর কাণে কাণে জল, তখন ছোট ছোট নদী ও বিল বাঁওড় মধ্যে সারি গাইতে গাইতে সাধারণ ব্যক্তিগণকে নৌকা বাইছ করিতে দৃষ্ট হইত। বিশেষতঃ বিজয়া দশমী ও অন্যান্য পর্ব্ব উপলক্ষে সারিগান বিশেষঃ আমোদজনক ছিল। তদ্ভিন্ন আরোহিদের নৌকাতেও মাল্লাগণ সারি গাইয়া মনের

প্রফুল্লতা প্রকাশ করিত। শাস্ত্রেও সারিগানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যনারায়ণের পাঁচলীতেও উল্লেখ আছে, "সারি গেয়ে মাল্লা মাঝি করিছে গমন" সারিগান অতীব সুশ্রাব্য ছিল। নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া গানগুলি প্রস্তুত হইত। যথাঃ—

"প্রাণত বাঁচেনারে নন্দ গোপাল রহিল কোন্ বনেঃ। আগইয়া দেখরে নন্দ আগইয়া দেখ ; রাজপথে দাঁড়াইয়া গোপাল বলে ডাকঃ।

অন্যস্থলে—

"বেলা গেল ওরে ভাই রাম কানাই ; নন্দ যশোদা বলে মনে নাই। বেলা গেল সন্ধ্যা হলো, অস্ত গেল ভানু, ধবলী সামলী লয়ে চল ঘরে কানু।

বর্ত্তমান সময়ে সারিগানের তাদৃশ আলোচনা নাই। তবে কোন কোন পল্লীগ্রামে বর্ষার সময়ে সারিগান, নৌকা বাইছ, ও তদুপলক্ষে ফৌজদারী এবং বহুসংখ্যক সাধারণ লোক ফাটকে যাওয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন তখন সমাজে বহুল ব্যক্তির বিরচিত সঙ্গীত সকল প্রচারিত ছিল। সঙ্গীত-প্রণেতাগণ নানাবিধ ভাবের ও বিবিধ রাগ রাগিণী ও তাল সংযোগে বহুবিধ সঙ্গীত প্রণয়ন করত স্বীয় রচনা-চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এবং সেই সময়ে সমাজের ব্যক্তিগণ সেই সকল সঙ্গীতগুলি আগ্রহ-সহকারে আলোচনা করিতেন। তাহাদের নাম ও বিরচিত দুই একটী সঙ্গীত নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

রামপ্রসাদের মালসা। সাধকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামপ্রসাদ সেই আগ্নাশক্তির একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি মহামায়ার মহিমা বর্ণন করত নানা ভাবের বহুসংখ্যক সঙ্গীত প্রণয়ন পূর্ব্বক হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম-ভক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। জনশ্রুতি তিনি এক লক্ষ সঙ্গীত প্রস্তুত করেন। কারণ তাঁহার একটী গানে উল্লেখ আছে "লাখ্ উকীল করেছি খারা, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া" ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন, কবি লক্ষ সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের সাধনা-বলে সেই ভক্তবৎসলা দেবী তাঁহার অনুগতা ছিলেন। এবং যখনই তিনি স্তবচ্ছলে সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, তখনি মহামায়া তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইতেন। জন-প্রবাদ, একদা রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বান্ধিতেছেন, তাঁহার জননী বাঁধ ফিরাইতেছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার জননী ওস্থান হইতে চলিয়া গেলে, ভগবতী রামপ্রসাদের সঙ্গীতে মুগ্ধা হইয়া, রামপ্রসাদের জননীর বেশে বাধ ফিরাইতে লাগিলেন। তৎপর রামপ্রসাদ দেবীর এইরূপ দয়ার বিষয় জানিতে পারিয়া অমনি গাইতে থাকিলেন "মন কেনে মায়ের চরণ ছাড়া ; তনয়-রূপে রামপ্রসাদের ঘরের কোণে বান্ধছ বেড়া।"

ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদের লেখা পড়ায় তাদৃশ ব্যুৎপত্তি ছিল না। তিনি অতি সাধারণ শব্দ যোজনায় সঙ্গীত প্রস্তুত করতঃ হৃদয়ের পবিত্র প্রেমভক্তি প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

রামপ্রসাদের রচিত সঙ্গীতগুলি "রামপ্রসাদী মালসী" বলিয়া খ্যাত। রামপ্রসাদী মালসীর সুর অতীব মধুময়; পদগুলিও অত্যন্ত সরল ও সুমধুর। রামপ্রসাদী মালসীগুলি শ্রবণ করিলে হৃদয়ে বিমল ভক্তিরসের সঞ্চার হইতে থাকে। তাঁহার অধিকাংশ সঙ্গীতগুলিই সেই মহামায়াকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনাপূর্ণ। কতকগুলিতে ভগবতীর মহিমা বর্ণন এবং কতকগুলি সঙ্গীতে মনের প্রতি সদুপদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

তখন সমাজের সমুদয় ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি ভক্তিসহকারে সর্ব্বদাই রামপ্রসাদী মালসীর আলোচনা করিয়া হৃদয়ে অনুপম আনন্দ অনুভব করিতেন। তদ্ভিন্ন কোন কোন যাত্রাগানের ও রামায়ণের দলে রামপ্রসাদী মালসী গাওনা হইত। দেশের আবাল বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সমুদয় ব্যক্তি অতিশয় আগ্রহের সহিত মালসী গান গাইতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রামপ্রসাদী মালসী বিলুপ্তপ্রায়।

প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর গত হইল "প্রসাদ-প্রসঙ্গ" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহাতে রামপ্রসাদের জীবনরচিত ও তাঁহার প্রণীত বহুল সঙ্গীতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার রচিত সঙ্গীতের কয়েকটী নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

(১) "মা আমার ঘুরাবি কত?

কলুর চখ ঢাকা বলদের মত। ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা! পাক দিতেছ অবিরত, একবার খুলে দে মা চখের ঠুলি দেখি তব অভয় পদঃ।

(২) মন তোমার নাই বিবেচনা। তুমি শ্যামা মা কে তাও চিন্‌লে না। ত্রিজগৎ হয় মায়ের রাজ্য, মনরে বুঝি তা জান না; তুমি তাঁর পূজা কর্‌বে দিয়ে আলো চাল আর বুট ভিজানাঃ। সকলেই হয় মায়ের ছেলে মন তুমি জেনে জান না। তুমি তাঁরে তুষ্ট কর্ত্তে চাও মন বলি দিয়ে ছাগল ছানা। মনের সহিত ভক্তি করা সেইত মায়ের উপাসনা; তুমি লোক দেখান ভক্তি কর মাত কখন ঘুষ খাবে না।

তৎকালে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রণীত অতি সারগর্ভ ও উপদেশ-পূর্ণ বহুল সঙ্গীত দেশে প্রচলিত ছিল। যথাঃ—

(১) "মনরে ভ্রান্তি তোমার। আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার। যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহা গচ্ছ বল তাঁকে, কেবা তুমি আন কাকে, ইকি ব্যবহার।

তিনি ইংলণ্ড যাত্রা কালীন সমুদ্রের ঘূর্ণিত বারিপুঞ্জ দৃষ্টি করিয়া ভীতচিত্তে বলিয়াছিলেন—

(২) পথ ভুলায়ে আমায় কোথা আনিলে। বুঝি প্রাণ যায় এবার ঘূর্ণিত জলে। কোথা রলে পিতামাতা, কে করে স্নেহ মমতা, প্রাণপ্রিয়ে রলে কোথা বন্ধু সকলে।

(৩) শেষের সেদিন মন কররে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে। রোগ শয্যায় শুয়ে, নিজপাপ স্মরিয়া, যখন দুইধারে নয়ন ধারা বহিবে, ভাই ভগিনী যত কান্দিবে অবিরত, তোমার শিশুসন্তান ধূলায় লোটাবে।

তৎকালে বর্দ্ধমানের দেওয়ান রঘুনন্দনের বিরচিত 'সঙ্গীত-গুলি "দেওয়ান মহাশয়ের গান" বলিয়া সমাজে প্রসিদ্ধ ছিল। দেওয়ান রঘুনন্দন একজন দেবীভক্ত ছিলেন! তিনি প্রত্যহ সায়ং সন্ধ্যা সমাপনান্তর "শ্যামা-বিষয়ক" একটী সঙ্গীত প্রস্তুত করতঃ ক্ষণকাল সেই সঙ্গীত আলোচনা করিয়া মনের পবিত্রতা ও শান্তি অনুভব করিতেন। দেওয়ান মহাশয়ের প্রণীত সঙ্গীত গুলিরপদ বিন্যাস ও সঙ্গীতের ভাব যারপরনাই প্রশংসনীয়। তৎকালে দেশে সেই সঙ্গীতগুলির বিশেষ সমাদর ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ আলোচনা নাই।

(১) নীল বরণা, নবীনা রমণী, নাগিনী জড়িত জটা বিভূষিণী, নীল নলিনী, য়িনি ত্রিনয়নী, হেরিলাম নিশানাথ নিভাননী॥ নিরমল নিশাকর কপালিনী, নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী, নিকর কর চারুসুশোভিনী, লোলরসনা করাল বদনী॥ নিতম্বে ঝুলিছে শার্দ্দুল ছাল, নীলপদ্ম করে করে করবাল, অপর দ্বকরে নৃমুণ্ড খর্পর, লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিনী॥ নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগমে যাঁহার নিগূঢ় না পায়, নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, নিত্য সিদ্ধা তারা নগেন্দ্র নন্দিনী।

২। কে ও রমণী, নীরদ বরনী, শব হৃদিপরে সমরে নাচিছে। চরণ তরুণ, অরুণ কিরণ নখরে নলিনী প্রকাশ হতেছে। মায়ের নাভি-সরোবর সলিল আধার, ত্রিবলির ছলে করিকর ধার, কুচ কুম্ভবর শুধাংশু শেখর যার পয়োধর ব্রহ্মা দিয়াছেন; কার নরশির হার গলে সুশোভন, বরাভয় অসি শ্রীকরে

ধারণ ; করাল বদন করি দরশন হৃষ্ট দেবগণ দানব কাঁপিছে ॥ মায়ের, বিম্বাধর মাঝে দন্ত সুশোভন, তিলফুল নাসা অতি সুগঠন, সীমন্তে সিন্দূর কিবা মনোহর, মেঘ পাশে যেন বিদ্যুৎ খেলিছে ; মায়ের, সুচারু চাচর চিকুর কান্তি, চাহিয়া চাতকে জলদ ভ্রান্তি, এ রণ শ্রান্তি কর মা শান্তি,আশুতোষ হৃদি আসন আছে ॥

জিলা রাজসাহী গোবিন্দ চৌধুরী নামে একজন লোক ছিলেন। তাঁহার লেখা পড়ায় তাদৃশ অধিকার ছিল না, কিন্তু সঙ্গীত রচনায় বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতগুলির রচনা ও ভাব বিশেষ প্রশংসনীয়। নিম্নে তাঁহার প্রণীত কয়েকটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করা গেল—

(১) "হরি দুঃখ দেও যে জনারে।

ও তার কেউ দেখে না মুখ, সংসার বিমুখ, সুখ নাই তার ত্রিসংসারে।

জলে কল্লে বাস ঘরে ধরে আগুন, পোড়ে পাকা বাড়ী ছোটে টালি চূণ, ঘরে ঢোকে ব্যাধি, মরে পুত্র আদি, পোষ্যপুত্র নিলে মরে।

খাঁটি সোণা রূপা কিন্‌লে মেজে ঘসে, কপাল গুণে হয় রাং তামা সিসে ; বাণিজ্যের আশে, গিয়ে দেশ বিদেশে হীরের দরে কেনে জিরে।

(২) "মনের বাসনা যদি গাবে গান। যদি থাকে বোধ উদ্ভব লয়ের স্থান ; তবে ত্রাণ কর মা তারা বলে, তারা নামে ছাড় তান॥ মনরে! বসন্তের হ'য় না বশ, বাহার বিষম বিরস, নট-

থটে করনা যোগদান ; অহং রাগ পরিহর, গৌরী আলাপন কর, জয় জয়ন্তী বল এক বার জুড়াক্ প্রাণ ; ক্রমে শ্রীরাগ জন্মিবে, হবে বাগেশ্রির অধিষ্ঠান॥ ওমন, দেশের মায়াতে যেন, মূল তান ভুল না মন, কর সদা শঙ্করাভবনে ধ্যান ; ভৈরবী না দিয়ে বাদ, কামেদ কেদার সাত, আপনি উদয় হবে রে কল্যাণ ; বল্লে তার স্বরে তার তারা কোমল হবে ভবে প্রাণ॥ মনরে, ছাড় আশার ব্যবহার, হিন্দুলে ভুলোনা আর, ললিত আলাপনে সবার তোষ প্রাণ ; ছায়ানটের সভায় এসে, আদর কেনে মালকোষে, পরজে কররে সদা আপন জ্ঞান ; এবার সিন্ধুতে পার পেলে পরে থাক্‌বে গোবিন্দের মানঃ॥

সেই সময়ে জিলা পাবনা, নীলরতন নামে একব্যক্তির গান রচনার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রচিত গান সকল নিতান্ত মন্দ ছিল না। এবং সমাজের লোকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত তাহা আলোচনা করিতেন। তাঁহার প্রণীত একটী গান নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

রাগিণী বেহাগ।

তাল—আড়াঠেকা।

"কায়ার সম্বন্ধ যত, কেবল মায়ার অধিকার।

মিছে কেবল ছায়া বাজি দারা পুত্র পরিবার।

যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, বৈষ্ণবী মায়াতে বদ্ধ, জগত সংসার ; শ্রীহরি করুণার সিন্ধু ইহ পরকালের বন্ধু, ভাব তাঁর পদারবিন্দ নীলরতন বলে সার।

তখন জিলা হুগলী-নিবাসী রামনিধি সেন নামে জনৈক ব্যক্তি আদিরস-ঘটিত বহুল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত সঙ্গীতগুলি 'নিধুর টপ্পা' বলিয়া সমাজে প্রসিদ্ধ ছিল। সমাজের নব্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ নিধুর টপ্পা অতীব আদরের সহিত আলোচনা করিতেন। কোন স্থানে যুবকবৃন্দের গানের বৈঠক হইলেই নিধুর টপ্পার ছড়াছড়ি পড়িয়া যাইত। বস্তুতঃ গানগুলিতে যেমনি আদিরসের দানসাগর, তেমনি স্থরের মধুরতা ও রচনার পারিপাট্য ইত্যাদি গুণ থাকাতে নিধুর টপ্পা যুবা হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সমাজের ব্যক্তিগণের পূর্ব্ব রুচির পরিবর্ত্তন হওয়াতে নিধুব টপ্পাগুলি দেশ হইতে অন্তঃহৃত হইয়াছে। অনেক কষ্টে কথঞ্চিৎ আদিরস বিরহিত একটী সঙ্গীত তাঁহার রচনা পারিপাট্যের দৃষ্টান্ত জন্য নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

রাগিণী ঝিঝিট।

তাল মধ্যমান—ঠেকা।

তোমারি তুলনা তুমি, এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পুর্ণশশী, সেও কান্দে কলঙ্ক ছলে।

সৌরভে গৌরবে, কে তব তুলনা হবে; তোমাতে তুমি সম্ভবে; যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গা জলে।

সেই সময়ে ধীরাজ বহুল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ধীরাজের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার রচিত সঙ্গীত

কয়েকটী নিয়ে উল্লেখ করা গেল। তদ্ভিন্ন স্থান বিশেষে আরও কতিপয় সঙ্গীত উল্লেখ করা যাইবে।

ধীরাজের কলিকাতা সহরে কোন অগম্য স্থান ছিল না। ছোট বড় সকল মহলেই তাঁহার গমনাগমন ছিল। এবং নব্য-বাবু-দল হইতে তিনি 'ধীরাজ' এই উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একদা একটী নব্য বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাবু তাঁহার ইয়ারগণ সহ 'টীফিন' খাইতে বসিয়াছেন; ধীরাজকে দেখিবা মাত্র সকলে বলিয়া উঠিলেন "এস এস ধীরাজ এস! ধীরাজ! আজ একটী নূতন গান গাও" তৎশ্রবণে ধীরাজ বলিলেন—বাবু! আপনারা যে 'টিফিন' খাইতেছেন তারই একটা গান গাই;" বাবুরা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "বেশ বেশ তাই গাও" তখন প্রত্যুৎপন্ন মতি ধীরাজ গান আরম্ভ করিলেন।

"বাবু! টেবিলে 'টিফিনে' বড় মজা হয়। বসে চেয়ারে যত ইয়ারে 'দেখি কাঁটা চাম্‌চা' সারি সারি ডিস সাজান সমুদায়॥ নিয়ে গরম্ চা বিস্কুট রুটি, বাবুর্চিদের ছুটাছুটী, লেমনেট্ সোডা ওয়াটার খানসামা এনে যোগায়; হেসে ধীরাজ বলে হদ্দ মজা, যদি চিরদিনই এম্নি রয়।

তখন কলিকাতা অনেক বড় বড় বাবুদের বাটীতে, পাখির দল প্রতিপালিত হইত। অর্থাৎ কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ও অলস প্রকৃতির লোক ঐ দলে থাকিয়া সর্ব্বদাই গাঁজা খাইত। খোরাক পোষাক গাঁজা সব সরকার হইতে পাইত। কাজের মধ্যে গাঁজা খাওয়া ও ঘুমান। এইরূপ পাখীর দল প্রতিপালন করা, সেবাজারে একটা

প্রশংসার কথা ও গৌরবের বিষয় ছিল। সুতরাং অনেকেই বহু অর্থব্যয় করিয়া এইরূপ অকর্ম্মণ্য জানোয়ার গুলি প্রতিপালন করিতেন। তাহারা সময়ে সময়ে দুই একটী অতি রহস্যজনক গান প্রস্তুত করিত যথাঃ—

"যড়ারন ভাই তোর কেনে নবাবী এত। তোর ঘরেতে নাই অষ্টরম্ভা, তোর কেনে এত কোঁচা লম্বা, তোর মা যে জগদম্বা, পেটের দায়ে ছাগল খেত। তোর বাপ্ ভিখারী মা লেঙ্গটা, তোর হাতে কেনে তীর কাম্‌টা, ও তোর টেরা সিঁথি জুলফী কাঁটা পায়েতে বনাতি জুত।

(২) তোর পাও চাপনে মলো বাবা নাম্‌না কেনে মা।

যদি বাবা মরে ওমা তারা তুমি হবা বিধবা।

কার্ত্তিক গণেশ দুটী ভাই, তাদের ত্রিজগতে কেহ নাই, যদি বাবা মরে তারা দুভাই কার কাছে দাঁড়াবে মা।

(৩) এবার কালী তোরে খাব। খাব খাবরে ওশিব শুদ্ধ খাব। খাই কুলে জন্ম আমার, আমি মা তোর খেগো ছেলে; এবার তুমি বা খাও আমি বা খাই দুয়ের একটা করে নেব। ডাকিনী যোগিনী দুটো তরকারী রান্ধিয়া লব, ও তোর গলে দোলে মুণ্ডমালা অম্বলে সম্ভারা দেব।

কালোয়াতের গান।

হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, দেবাদিদেব মহাদেব প্রথমতঃ সঙ্গীত বিদ্যা প্রকাশ করেন। পশুপতির সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে বিষ্ণুর দেহ দ্রবীভূত হইয়া ত্রিতাপনাশিনী গঙ্গাদেবীর উদ্ভব

হয়। বেদমাতা সরস্বতী সদাশিবের প্রকাশিত সঙ্গীত বিদ্যার প্রতিনিয়ত আলোচনা করিয়া থাকেন। সংসার-বিরাগী ভক্ত-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি নারদ, বহুল রাগ রাগিণী সংযোগে বীণাযন্ত্র বাজাইয়া অহর্নিশি সুধাময় হরিগুণ গান করিতেন। প্রাচীন সময়ে সেই তপোবনবাসী আর্য্য ঋষিগণ নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ রাগ রাগিণী সম্মিলনে শ্যাম, যজু, ঋক্, অথর্ব্ব বেদচতুষ্টয় গান করিয়া হৃদয়ে অনুপম শান্তি অনুভব করিয়াছেন। কলিযুগেও বহুল ব্যক্তিকে সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। মুসলমান রাজত্ব সময়ে সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ সমাদর ও আলোচনা ছিল। নবাবদিগের সভাতে বেতনভোগী প্রধান প্রধান 'কালোয়াতেরা' চিত্ত বিমুগ্ধকর সঙ্গীত দ্বারা নবাব-সাহেবদের মনোরঞ্জন করিতেন।

সঙ্গীত শাস্ত্রে ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর কথা উল্লেখ রহিয়াছে। যথা মুলতান, গৌরী, জয়জয়ন্তী, দেশ,পরজ, সিন্ধু, খাম্বাজ, বসন্ত,মেঘমল্লার,ভৈরবী,পূরবী,ঝিঁঝিট,বাগেশ্রী, মালকোষ, দীপক ইত্যাদি। তৎপর উল্লিখিত ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সহযোগে অন্যান্য বহুবিধ রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি এই সপ্তস্বরকে উদারা, মুদারা ও তারা এইতিন, (গ্রামে) স্থানে সংস্থাপিত করিয়া, রাগ রাগিণীর আলোচনা করিতে হয়। সোম, বিষম, ও নান এই তিন স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আড়াই ও দেড়পেচ অনুসারে গান ধরিতে ও ছাড়িতে হইবে। যাঁহারা উল্লিখিত পদ্ধতি স্থির রাখিয়া, সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা

করিতে সক্ষম, তাঁহারাই প্রকৃত 'কালোয়াত' এবং তাঁহারাই সমাজে বিশেষ সমাদর ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক রাগ রাগিণী আলোচনার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা প্রত্যূষে ভঁয়রো, তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে বিভাস, তৎপর ললিত, মধ্যাহ্নে বেহাগ, স্বায়ংকালে পুরবী ও আলেয়া ইত্যাদি। বর্ত্তমান সময়ে রাত্রি দুইপ্রহরের পর, বেহাগ রাগিণীর আলাপ করার নিয়ম রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পূর্ব্বে দিবা দুইপ্রহরের সময় বেহা-গের আলোচনা হইত। তৎপর নবাবদের সময়ে ১টী বিশেষ দুর্ঘটনা হওয়ায় দিবাভাগে বেহাগের আলোচনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ঘটনাটী এই:—

একদিন দিবা দুইপ্রহরের সময় নবাবের নহবত থানায় বেহাগ রাগিণীর আলোচনা হইতেছে, এমন সময়ে নবাবের একজন দাসী একটী শিশু সন্তান কোলে করিয়া মাছ কাটিতেছিল। সে বেহাগ রাগিনীর আলাপন শুনিয়া এরূপ মুগ্ধা হইয়াছিল যে, মাছ কাটিতে শিশু সন্তানটীকে কাটিয়া ফেলিল। নবাব এই নিদারুণ ঘটনা শ্রবণে, দিবাভাগে আর বেহাগ রাগিণীর আলোচনা হইতে পারিবে না বলিয়া তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করিলেন। সেই হইতে দিবাভাগে বেহাগের আলাপচারী বন্ধ হইয়া গেল।

সুপ্রসিদ্ধ 'কালোয়াত' "মিঞা তান সান" দিল্লী মহানগরীতে বাস করিতেন। এবং বাদসাহের সরকারে বেতনভোগী 'কালো-য়াত' ছিলেন। 'কালোয়াতি' গানের সর্ব্বপ্রথমে তিনিই উৎকর্ষ

বর্দ্ধন করেন। অদ্যাপি দিল্লীতে তানসানের 'কয়বর' রহিয়াছে। এবং সকলেই উক্ত 'কয়বরে' ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 'তানসান' বহুল সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের দেবদেবীর প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার প্রণীত একটী সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"এমা গঙ্গে! মাগো! অন্তে যেন তব সলিলে। তব জলে মম কায়,মকরা কুম্ভীরে খায়,(এমা) অস্থিগুলো রহে যেন বালু মিশালে। কহে মিয়া 'তানসান' না জানি মা বেদপুরাণ, এমা! অন্তিমকালে কৃপাময়ী, স্থান দিও মা চরণতলে।

এতদ্ভিন্ন তাঁহার প্রণীত বহুসংখ্যক বাঙ্গালা ও হিন্দীগান দেশে প্রচলিত আছে। বাহুল্য প্রযুক্ত উল্লেখ করা গেল না।

জনপ্রবাদ কালোয়াতেরা যখন যে রাগিণীর আলাপচারী করিতেন, তখন সেই রাগিণী মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হইত। একদিন বাদসাহ তানসানকে দুইপ্রহরের সময়ে 'দীপক' রাগিণীর আলাপচারী করিতে আদেশ করেন। তাহাতে তানসান বলিলেন, এ দীপক রাগিণী আলাপের সময় নহে। কিন্তু বাদসাহ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, তানসান অগত্যা বাধ্য হইয়া দীপক রাগিণীর আলাপচারী আরম্ভ করিলেন। অচিরাৎ সভাস্থল ভয়ানক গরম হইয়া উঠিল। এবং তানসানের শরীর হইতে অজস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তানসানের স্ত্রীরও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি স্বামীর এই বিপ-

দের সংবাদ শ্রুত হইয়া, অগৌণে মেঘমল্লার রাগিনীর আলাপচারী আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিপতন হইল বটে। কিন্তু তাহাতে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক তানসানের আর জীবন রক্ষা হইল না। এই জন প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা ভগবানই জানেন।

অতি প্রাচীন সময়ে দিল্লী নগরে অনেক সুশিক্ষিত গায়ক-গণের অবস্থান ছিল। অত্রদেশীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তি সঙ্গীত শিক্ষার জন্য তথায় গমন করিতেন। বর্ত্তমান সময়েও তথায় বহুসংখ্যক গায়কগণ বাস করিতেছেন।

কালোয়াতেরা সাচ্চা রাগ রাগিণী ও তাল সম্মিলনে খেয়াল, ধ্রুপদ, গজল, টপ্পা প্রভৃতি সঙ্গীতের আলোচনা করিয়া থাকেন। কালোয়াতদিগের তহবিলের সেই খাটি জিনিষে কিছু কিছু 'খাদ' মিশ্রিত হইয়া 'বৈঠকারী' অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তৎপর আরো কিছু খাদ,সহযোগে বাইজীদের মুখে আলোচিত হইতে দেখা যায়। ক্রমশঃ তিন নকলে আসল খাস্তা হইয়া, সেই দেবগণ-সমাদৃত সুমধুর রাগ রাগিণী খাটি সোণার পরিবর্ত্তে 'গিলটী' করা তামার রূপ ধারণ করিয়া যাত্রার দলে বিরাজ করিতে থাকে।

পূর্ব্বে এদেশে বহুল কালোয়াত দেখা যাইত, বর্ত্তমানে কালো-য়াতের গান এদেশে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে কখন কখন 'বৈঠখারী' গায়কগণ এদেশে দৃষ্ট হয়। জিলা ফরিদপুর খলিল-পুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুহ এবং স্থানে স্থানে কোন কোন ব্যক্তির গান বাজনায় বিশেষ দক্ষতা রহিয়াছে।

বাদ্যচর্চ্চা

যেমন অলঙ্কার-পরিশূন্য মানবদেহ কখনই দর্শকের মনোহরণ করিতে পারেনা, সেইরূপ, বাদ্যবিহীন সঙ্গীতও শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে অক্ষম। সেইজন্যই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। সকল যুগে এবং সমুদায় দেশেই গানবাদ্য একত্রে সম্মিলিত হইয়া অনুপম মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

বাদ্য সঙ্গীতের সহগামী। অর্থাৎ বাদ্য সঙ্গীতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। যদি কখনও বাদ্য সঙ্গীতের অগ্র কিম্বা বহু পশ্চাৎ গামী হয়, তাহা হইলে গানবাদ্য সম্মিলিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইতে পারে না। এইজন্যই গানবাদ্য আলোচনা সময়ে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। বাদকেরও সোম, বিষম ও মান, এই ত্রিবিধ স্থানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন।

বাদ্যেও বহুবিধ তাল আছে, যথা একতালা, আড়া, মধ্যমান, ঝাঁপতাল, ঠুমরী, তেওট, খেমটা ও দশকুশি ইত্যাদি এবং বৃক্ষের শাখা প্রশাখার ন্যায় বাদ্যেরও শাখা প্রশাখা আছে। যথা মধ্যমানের ঠেকা, আড়াঠেকা, খেমটা, গড়খেমটা, আড়খেমটা, প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি প্রধান প্রধান তাল আছে। তাহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। সে তালগুলি পাখোয়াজেই 'পাখোয়াজীগণ' আলোচনা করিয়া থাকেন, যথা—ধ্রুপদ (চৌতাল) পঞ্চম সোয়ারী, সুরফাঁক, তেওড়া, ব্রহ্মতাল ও রুদ্রতাল ইত্যাদি। ভাল ভাল ঢুলিরাও চড়াঢোলে ঐ সকল তালের আলোচনা করিয়া থাকে।

সে সময়ে নবাবদিগের গানের মজলিসে বহুল 'পাখ-য়াজি' থাকিতেন। এবং দেশেও অনেক 'পাখয়াজি' দৃষ্ট হইত। বনবিষ্ণুপুরের রঘুবীর বাগ্‌ছি একজন প্রসিদ্ধ 'পাখোয়াজি' ছিলেন। তদ্ভিন্ন ঢাকায় হরিমোহন বাবু, জিলা ফরিদপুর চাঁদপুর-নিবাসী চন্দ্রকুমার বক্‌সীও পাখোয়াজে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

তবলাতেও উক্ত তাল সমূহের আলোচনা হয়। যাঁহারা তবলা ভাল বাজাইতে পারেন, তাঁহাদিগকে 'তবল্‌চি' বলে। কিন্তু তবল্‌চি অপেক্ষা 'পাখোয়াজি' দিগের সম্মান ও সমাদর অধিক। এবং 'পাখোয়াজি'গণ তবলায় ধ্রুপদাদি আলোচনা করা অপমান বোধ করেন।

বাদ্যের তাল সমূহের বহুবিধ 'রং' পরণ, আছে। বাদকগণ প্রকৃত তাল আলোচনার সময়ে তৎসঙ্গে নানাবিধ (রং পরণ) সম্মিলন করায় সোণায় সোহাগার ন্যায় বাদ্যের মাধুর্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু গানবাদ্যে সাচ্চা রাগ রাগিণী ও তালের আলোচনা করাই বিশেষ প্রশংসার কার্য্য।

তখন দেশে বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল। যথা—বেহালা, এসরাজ, সারঙ্গ, জলতরঙ্গ, সেতার, বীণা, আড়বাঁশী, সানাই, রোসন চৌকী, পাখোয়াজ, তবলা, ঢোলক, চরাঢোল, ছোট টিকারা, নাগরা, জগজম্ফ, কড়কা, ডগর, খঞ্জরী, খোমক, সারিন্দা, দোতারা ইত্যাদি। বর্ত্তমানে উল্লিখিত কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র বিলুপ্ত প্রায়। যথা বীণা, এসরাজ, জলতরঙ্গ ইত্যাদি। সে সময় বকুমিঞা, সাধুমিঞা বেহালাতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। বর্ত্তমানে

প্রসন্ন ওস্তাগার বেহালায় বিশেষ বিখ্যাত। এবং জিলা বরিশালের শিবুঢুলি, বৈকুণ্ঠ, বড় বনমালী ও ছোট বনমালী, এবং জিলা যশোহরের রূপচাঁদ দাই ও জিলা ফরিদপুরের ঈশ্বর ঢুলি, ব্রজঢুলি সকলকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দৃষ্ট হইত। বর্ত্তমানে তাদৃশ সুশিক্ষিত ঢুলি দেশে অতি কম দেখা যায়।

এক্ষণে ভিন্ন দেশীয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন দেশীয় বাদ্যযন্ত্রেরও দেশে আবির্ভাব হইয়াছে। যথা—ফ্লুট, হারমোনিয়ম ইত্যাদি। সমুদায় গান বাজনার আশরেই এক্ষণে দেশীয় তানপুরার পরিবর্ত্তে ভিন্নদেশীয় হারমোনিয়ম ও ফ্লুটের একাধিপত্য দৃষ্টিগোচর হয়। তবে গরীব বেহালা ও তবলার অবস্থানও এককালীন বিলুপ্ত হয় নাই।

নাটক অভিনয়।

বহুকাল পূর্ব্বে বহুল কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ নাটক প্রকাশিত হইয়া থিয়েটার কোম্পানী দ্বারা অভিনীত হইতেছিল। কলিকাতা নগরীতে সর্ব্ব প্রথমে "বেঙ্গল" ন্যাসন্যাল থিয়েটার কোম্পানী সংস্থাপিত হয়। ক্রমশ "ষ্টার","পার্শিয়ান", ম্যালমোলার প্রভৃতি বহু সংখ্যক থিয়েটার কোম্পানী স্থাপিত হইল। তৎপর প্রত্যেক জেলা ও প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে থিয়েটারের দল দেখা দিল এবং বহুবিধ নাটক অভিনয় হইতে থাকিল।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় বলিয়াছিলেন "নাটকনা-টক না মিঠে" কিন্তু অভিনেতাদের

পারদর্শিতানুসারে কোন কোন নাটক, অভিনয় দর্শক-বৃন্দের অতীব মনোরঞ্জন হইয়া থাকে। স্বদেশহিতৈষী মনস্বী দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত "নীলদর্পণ" নাটক সর্ব্বপ্রথমে সমাজে অভিনীত, হয়। অল্প দিন গত হইতে না হইতে উক্ত নাটক অভিনয়, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্ধ হইয়া গেল। বহুদিন পূর্ব্বে একটি থিয়েটার গৃহে 'ভারতে যবন' এই নাটক খানি অভিনয় হইতেছিল। অভিনেতাগণ এমনি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতেছিলেন যে, দর্শকগণ অভিনয় দর্শনে এককালীন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যখন সেই রুগ্না, শীর্ণা ও কঙ্কলাবশিষ্ঠা ভারতমাতার বক্ষস্থলে,ভীম রূপী যবন সক্রোধে পদাঘাত করিল, দুঃখিনী ভারতমাতা ভূতলে নিপতিতা হইয়া ভগ্নস্বরে, সকরুণ রোদন নিনাদে অসীম গগন বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন, তখন দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে পশ্চিম দেশীয় স্বদেশপ্রিয় একটী বীর পুরুষ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, স্বীয় কটিস্থিত তরবারী নিষ্কোষিত করিয়া "হারামজাদ্ খাড়া রহ" বলিয়া যেমন আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদানে উদ্যত হইলেন, অমনি ড্রপ্ সিন্ পড়িয়া গেল এবং উপস্থিত দর্শকগণ তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। এই কথা প্রকাশ হইলে 'ভারতে যবন' নাটকের অভিনয় ও মুদ্রাঙ্কণ গবমেণ্ট বন্ধ করিলেন।

ক্রমশঃ রামের রাজ্যাভিষেক, সতীনাটক, কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব, অভিমন্যু-বধ, শকুন্তলা, হরিশ্চন্দ্র, পার্থ-পরাজয়, প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ আধুনিক বহুবিধ নাটক প্রকাশ ও অভিনয় হইতে

থাকিল। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বীয় প্রণীত নানাবিধ নাটক অভিনয় করতঃ সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত বামন ভিক্ষা, নিমাই সন্ন্যাস, প্রভৃতি নাটক প্রকাশিত হইল।

এক সময়ে কলিকাতায় নাটক অভিনয়ের মহাধুম ছিল। প্রত্যেক শনিবার রাস্তায় রাস্তায় নোটিস জারির ধুম, সন্ধ্যা বিগতে থিয়েটার-প্রাঙ্গণ জুরিগাড়ীতে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইত।

কোন কোন নাটকের দলে নাটক শেষে "ফার্স" দেখান হইত। 'বাঙ্গালী সাহেব' "চক্ষুদান" 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'বুড়শালিকের ঘাড়ে রোম' বিবাহ বিভ্রাট ইত্যাদি। তখন কোন কোন দলে স্ত্রীলোকের পার্ট গুলি স্ত্রীলোক কর্তৃক সম্পাদিত হইত।

বর্ত্তমান সময়েও নাটক অভিনয় এককালীন বিলুপ্ত হয় নাই। নূতন নূতন নাটক প্রণয়ন ও অভিনীত হইতেছে।

পুতুল নাচ।

সে সময়ে পুতুল নাচ সমাজে প্রচলিত ছিল। দেশের হীনবংশীয় ব্যক্তিগণ ৫।৭ জন একত্রিত হইয়া পুতুল নাচের দল বান্ধিয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করিত। সোলা দ্বারা বহুবিধ পুতুল প্রস্তুত করিয়া রেশমের ডোর দিয়া তাহা নাচাইত এবং এক প্রকার বাঁশী দ্বারা কথা বার্ত্তা বলিত।

গানের পালার ন্যায় পুতুল নাচেরও পালা নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাম রাবণের যুদ্ধ, মহীরাবণ বধ, সীতার বনবাস, লব কুশের যুদ্ধ

ইত্যাদি। পালার মধ্যে মধ্যে গান বাদ্য ছিল। পুতুলগুলি একরূপ অভিনয় করিত। বস্তুতঃ, পুতুল নাচে কিছু কিছু চমৎকারীত্ব ও কথঞ্চিৎ আমোদও ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পুতুল নাচ প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ছায়াবাজি (বাওস্কোপ) দেশে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

শিক্ষা প্রণালী।

বাঙ্গালা ভাষা।

আমাদের বর্ণিত সময়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে পারস্য ভাষার বিশেষ ব্যবহার ছিল। কারণ সে সময়ে সমুদায় রাজকার্য্য পারস্য ভাষায় নিষ্পন্ন হইত। সুতরাং সকলেই সযত্নে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতেন। কিন্তু পারস্য ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয় সংস্থাপিত ছিল না। গ্রামের কোন একটি বড় লোকের বাটীতে একজন মুসলমান মৌলবী থাকিতেন। তাঁহার নিকটে সকলে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। অনেকেই "আলেফ্, বে,তে,ছে প্রভৃতি অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়া তৎপর গোলেস্তা কেতাব অধ্যয়ন করতঃ বিদ্যা শেষ করিতেন। কেহ কেহ, গোলেস্তা, পাঞ্জেনা মা, হাফেজ প্রভৃতি উচ্চ স্থানীয় পুস্তক সকল পাঠ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেন। পারসী মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাষা। সুতরাং হিন্দুদিগের ব্যবহৃত ভাষার বিপরীত। কারণ বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে বাম দিক হইতে আরম্ভ করিতে হয়, কিন্তু পারস্য ভাষা দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। উল্লিখিত সময় হইতে ইংরাজী ভাষার সূত্রপাত হইলেও, সে সময়ে পারসী ভাষা এককালীন বিলুপ্ত হয় নাই।

পারসী ভাষাও তখন কিছু কিছু প্রচলিত দৃষ্ট হইত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন পূর্ব্বাপরই সমভাবে চলিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন গ্রামে গ্রামে স্কুল সংস্থাপিত ছিল না। দেশের লোক গুরু মহাশয়ের চৌপাড়িতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন।

দুই তিন গ্রাম লইয়া একটী চৌপাড়ি থাকিত। গ্রামের কোন একটী সাংসারিক কার্য্যের অনুপযুক্ত, প্রাচীন ব্যক্তি গুরুমহাশয়ের পদে নিযুক্ত থাকিতেন। গুরুমহাশয়দের তখন কোন পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। যিনি দুইশত নামতা ও কড়া, গণ্ডা, চাণক্যের একশত আটটী শ্লোক,মুখে মুখে এবং শিশুবোধক পুস্তকখানির দাতাকর্ণ,গুরুদক্ষিণা রামায়ণ ও মহাভারত সুর করিয়া পড়িতে পারিতেন ও কাঠাকালী, বিঘাকালী, জমাওয়াশীলবাকী লিখিতে জানিতেন, তিনিই উক্ত পদ প্রাপ্ত হইতেন। গ্রামের মধ্যে কোন একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে চৌপাড়ি থাকিত; গ্রামের সমুদায় বালকগণ প্রাতে ও বৈকালে উক্ত চৌপাড়ির গুরুমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। গুরু-মহাশয় মধ্যভাগে এক খানি জলচৌকির উপরে, একগাছি বেত্র হস্তে উপবিষ্ট থাকিতেন। চতুর্দ্দিকে বালকগণ মাদুর বা চাটা-ইর উপরে বসিয়া কেহ তালপত্র, কেহ কদলীপত্র, কেহ কাগজে লেখাপড়া করিত। গুরুমহাশয়দের শিক্ষা সম্বন্ধে ততদূর অধিকার না থাকিলেও মাইর পিটের হাতটা বিশেষ প্রবল ছিল। যখন গুরুমহাশয়ের হৃদয়ে কোন কারণে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত, তখনই তিনি হুতাশন মূর্ত্তি ধারণ করতঃ আসন পরিত্যাগ

করিয়া, একদিক হইতে ছাত্রদিগকে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিতেন। যেন গোষ্ঠবিহারী 'শ্রীকৃষ্ণ' পাঁচনী হস্তে গরু ঠেঙ্গাইতেছেন। আর ছাত্রগণ যেন 'হাম্বা হাম্বা' রবে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিতেছে। সে সময় ছাত্রদিগের শাসন ভাগটা কিছু অধিক পরিমাণেই সম্পাদিত হইত। সচরাচর গরু চোরের উপর দারোগা বাবুদের যেরূপ শাসন করিতে দেখা যাইত; ছাত্রদিগের প্রতি গুরু মহাশয়দের শাসন ভাগটা তাহা অপেক্ষা বড় কম ছিল না। বেত্রাঘাত, চপটাঘাত, মুষ্টাঘাত, চৌদ্দ পোয়া, রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকা ইত্যাদি। বর্ত্তমান সময়ে স্কুল-মাষ্টারেরা ছাত্রের প্রতি তাহার শতাংশের একাংশ শাসন করিলে, বোধ হয়, মাষ্টার বাবুদের দ্বীপান্তর প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। পক্ষান্তরে ছাত্রগণও গুরুমহাশয়কে সময় সময় লাঞ্ছনা করিতে ত্রুটি করিত না। গুরুমহাশয়ের বিছানায় 'বিছুটির গাছ' কণ্টক রাখা, শয়ন ঘরের দ্বারদেশে মল মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি। বর্ত্তমানে ছাত্রগণ স্কুলে অনুপস্থিত হইলে, জরিমানা গ্রহণের নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে কোন ছাত্র পাঠশালায় উপস্থিত না হইলে, অমনি গুরু মহাশয় তিন চারিজন প্রধান ছাত্র প্রেরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতেন, এবং স্বয়ং উত্তম মধ্যম প্রহার করিতেন। এরূপ প্রহারে অভিভাবকেরা কিছুমাত্র অসন্তোষ হইতেন না। বরং অভিভাবকগণ যখন ছাত্রদিগকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিতেন, তখনই গুরু মহাশয়কে বলিতেন, "চামড়া, মাংস আপনার, প্রাণ আমার।" কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোন শিক্ষক ছাত্রদিগকে সেরূপ

প্রহার করিলে, অভিভাবকগণ কালবিলম্ব না করিয়া অমনি আদালতে উপস্থিত হইবেন।

বালকদিগের প্রথমতঃ থারা তাল পত্রে ও কদলি পত্রে অক্ষর পরিচয় শেষ হইলে, তৎপর কদলি পত্রে ফলা, বানান, নাম, পত্র, জমাওয়াশীল বাকি, কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, সেরকিয়া, কাঠাকিয়া কাঠাকালি, বিঘাকালী, প্রভৃতি শিক্ষা হইত। তখন কিয়, কর; ফল, কন, কুয়, কম, আর্ক, আঙ্ক, আস্ক ও সিদ্ধি, এই কয়েকটী ফলা নির্দ্দিষ্ট ছিল। (য) ফলা, (র) ফলা নাম তখন প্রচলিত ছিল না। এবং তখন প্রত্যেক অক্ষরের এক একটি নাম নির্দ্দিষ্ট ছিল, যথা আকড়ে ক, বকৃঠুঠে থ, ন্যাঙ্গা গ, মাথায় পাগড়ি ঙ, থামে কান্তা প, গোদা ম, তেপুটলে শ, পেট কাটা ষ, টাণা হ ইত্যাদি। এবং অক্ষর পরিচয় ও ফলা, বানান শিক্ষার জন্য কোন পুস্তক ও দৃষ্ট হইত না। হাতে লিখিয়াই অক্ষর পরিচয় শেষ করা হইত। এই সমুদায় শিক্ষা শেষ হইলে, তৎপর কাগজ হাতে দেওয়া হইত। বালকদিগকে একদিন ভাল দিন ও তিথি নক্ষত্র দেখিয়া কাগজ হাতে দেওয়ার নিয়ম ছিল। সে দিন গুরু মহাশয়েরও কিছু প্রাপ্তি ছিল। কাপড়, চাউল, ডাইল নগদ পয়সা ইত্যাদি তৎভিন্ন প্রত্যেক দিন ছাত্রদিগের নিকট হইতে, গুরুমহাশয়, মাথা তামাক, শশ্টা কলাটা, দুই একটা পয়সা আদায় করিয়া লইতেন। ছাত্রেরাও মাইর বাঁচিবার জন্য সেই সকল উৎকোচ সন্তোষের সহিত প্রদান করিত। তখন চৌপাড়িতে কড়াকিয়া ও নামতা প্রত্যেক দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়ান হইত। লেখা পড়া শেষ

হইলেই দুই বেলা ছাত্রগণ শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত, তৎপর গুরুমহাশয়"দুই অঙ্কে দুই, তিন অঙ্কে তিন, এক কড়ার এক কড়া নামে, দুই কড়ার দুই কড়া নামে, চারি কড়া নামেনা হাতে এক গণ্ডা, প্রভৃতি পড়াইতেন। বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে ঐ সকল পড়িত। বালকগণ কাগজ হাতে লইয়া গ্রামের মধ্যে যাহার হাতের লেখা উৎকৃষ্ট, তাহার হাতের লেখা একখানি 'মস, পত্র লইয়া তাহা দেখিয়া মক্স করিত, যাহার হাতের লেখা খুব ভাল ছিল, তিনি 'খোস খত্' লেখক বলিয়া গ্রামে বিশেষ মান্য গণ্য ছিলেন। "খোসখত্" লেখা অভ্যাস জন্য সকলেরই বিশেষ যত্ন থাকিত। তৎকালে হাতের লেখা শিক্ষার জন্য দেশে একটি শ্লোক প্রচারিত ছিল।" সমানী সমশীর্ষানী, ঘনানী বিরলা নীচ" এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া সকলে হাতের লেখা শিক্ষা করিতেন।

হাতের লেখা, পোক্ত হইলে কেহ সত্য নারায়ণের পুস্তক, কেহ কেহ রামায়ণ, মহাভারত পুস্তক সকল নকল করিতেন, এবং শিশুবোধক পুস্তক পাঠ করিয়া শুভঙ্করী আর্য্যা শিক্ষা করিতেন। এই হইলেই একরূপ বিদ্যার শেষ হইত। গণিত শাস্ত্র শিক্ষা, যোগ বিয়োগ অঙ্ক, জমা খরচ লেখা পর্য্যন্তই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

তখন প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর স্কুল এবং জিলা ঢাকা, কলিকাতা ও হুগলী এক একটী নর্ম্মাল স্কুল সংস্থাপিত ছিল। সকলে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করতঃ ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন। কোন কোন বড় বড় গ্রামেও এক একটী ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপিত ছিল।

সেই সকল গ্রাম্য স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ছাত্রগণ নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন।

ক্রমশঃ দেশে বাঙ্গালা শিক্ষার পথ বিস্তৃত হইতে লাগিল। অনেক গ্রামে ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে কতকগুলি স্কুলের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট হইতে, এবং কতকগুলি স্কুলের ব্যয়ের কতকাংশ স্থানীয় লোকের নিকট আদায় করা হইত। এইরূপে দেশে শিক্ষার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে চলিল। স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তৎপর নিম্ন শিক্ষা বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। ১২৭২ সালে গুরু পাঠশালার সৃষ্টি হইল। প্রথমতঃ উত্তর বঙ্গে গুরু পাঠশালার সূত্রপাত হয়। জিলা রাজসাহী একটী 'গুরুট্রেনিং' স্কুল সংস্থাপিত হইল। উক্ত স্কুলে শিক্ষা করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিতগণ গ্রামে গ্রামে গুরু পাঠশালা খুলিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উক্ত পাঠশালাগুলি উচ্চ প্রাইমেরী ও নিম্ন প্রাইমেরী (ক) মিতি, (খ) মিতি, (ক) মান (খ) মান ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ হইল। উত্তরোত্তর এই সকল পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে অসংখ্য উচ্চ ও নিম্ন প্রাইমেরী পাঠশালা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বঙ্গভূমে এইরূপ নিম্নশিক্ষা বিস্তার হওয়াতে, দয়াবান গবর্ণমেণ্টের সেই শুভকরী অনুষ্ঠানের ফল, দেশের পক্ষে বিষময় ফলে পরিণত হইতে চলিল। দেশের সর্ব্বসাধারণের গৃহে শিক্ষার স্রোতঃ প্রবেশ করিল। ইতর শ্রেণীর বালকগণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, সভ্য ভব্য হইয়া দঁড়াইল। জাতীয়

ব্যবসায় ঘৃণা জন্মিল। চাকুরীর প্রত্যাশায় নিজ নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ করিল। হালের ছেলে হাল ছাড়িল, জেলের ছেলে জাল ছাড়িল, তাঁতির ছেলে তাত ছাড়িল; রজকের ছেলে বস্ত্র-ধৌত-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের ঘোর দুর্দ্দিন ও ভীষণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।

ইংরাজী ভাষা।

অতি প্রাচীন সময়ে ইংরাজি শিক্ষার জন্য কলিকাতা মহা-নগরীতে, প্রেসেডেন্সী ও সংস্কৃত এবং ডব সাহেবের মিশনরী কলেজ সংস্থাপিত ছিল। তৎপর ঢাকা হুগলী ও ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন জিলাসমুহে বহু সংখ্যক কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইল। এবং দেশের লোকের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় এবং বড় বড় পল্লিগ্রামে এণ্ট্রান্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান সময়ে বহুল পল্লিগ্রামে এণ্ট্রান্স স্কুল ও কালকাতা সহরে বহুসংখ্যক কলেজ স্থাপিত হওয়ায় দেশীয় লোকের ইংরাজী শিক্ষার প্রশস্ত পথ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

তখন ইংরাজী শিক্ষায়, "জুনিয়ার ও সিনিয়ার" এই দুইটি পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট ছিল। অনেকেই ঐ দুইটী পরীক্ষা প্রদানে সম্মানিত হইতেন। এরপর "লাইব্রেরী এগ্‌জামিন" নামে আর একটী

উচ্চ পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সমাজে সম্মানের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন।

তৎপর প্রাচীন "জুনিয়ার সিনিয়ার" পরীক্ষা বিলুপ্ত হইয়া এনট্রান্স, এল-এ, বি-এ, এম-এ, নামক পরীক্ষার সৃষ্টি হইল। এর পর ক্রমে "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" পরীক্ষা প্রচলিত হয়। দেশের লোকে ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্মানের উচ্চাসনে পদার্পণ করতঃ গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন বি-এ, এম-এ উপাধিধারী ব্যক্তি, সমাজে প্রায়ই দেখা যাইত না। এমন কি, এনট্রান্স-পাশ ব্যক্তিরই মান মর্য্যাদার শেষ ছিল না। এনট্রান্স পাশ দূরের কথা, এনট্রান্স ক্লাশের বা তাহার নিম্ন ক্লাশের ছাত্রদেরই পঁচিশ টাকা বেতনের চাকুরী বান্ধা ছিল। এবং তাঁহারাই সমাজে যারপরনাই সমাদর প্রাপ্ত হইতেন।

তখন বি-এ পাশ ব্যক্তিকে, সকলে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও এক অপূর্ব্ব লোক বলিয়া মনে করিতেন। জিলা বগুড়া একটী 'বি-এ' পাশ ডিপুটী আসিলেন, তখন সকলেই বলিতেন "এস 'বি-এ' বাবুকে দেখিতে যাই।

ক্রমশঃ বি-এ, এম-এ পাশের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহাদের সম্মান ও সমাদরের লাঘব হইতে থাকিল। বৎসর বৎসর দুশ পাঁচশ ও হাজার হাজার ব্যক্তি, বি-এ, এম-এ, পরীক্ষায় পাশ হইতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দেশে বি-এ, এম-এ র আর অভাব নাই। ঝুড়ি ঝুড়ি, ডজনে ডজনে, বি-এ, এম-এ, দেশে

বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বের সে মান, মর্য্যাদা ও সমাদর অন্তর্হিত হইয়াছে।

প্রায় ৪০ বৎসর গত হইল, কোন সংবাদ পত্রে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধ লেখক বলিতেছেন :—

আমি একদিন স্বপ্নে দেখিতেছি। আমি যেন বড় বাজা-রের সদর রাস্তার ধারে একটি তেতালা দালানের বাতায়নে বসিয়া আছি। দেখিলাম 'জন্ সনস্' ডিক্সনারী মাথায় লইয়া কতকগুলি লোক "চাই ভাল বি, এ, চাই ভাল এম, এ, এই বলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে চেঁচাইতে রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণ পাত কিম্বা তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না" তখন এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সকলেই উচ্চ হাস্য ও প্রবন্ধ লেখককে উপ-হাস করিয়াছিলেন। কিন্তু "কালস্যঃ কুটিলাগতি",কালের কুটিল গতি প্রভাবে,বর্ত্তমান সময়ে সত্য সত্যই দেশে সেই দশাই উপস্থিত হইয়াছে। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবস্থাও এককালীন পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সেই দেবতা সদৃশ ভক্তি-ভাজন বি-এ, এম-এ গণ এখন গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের নিকটে, ভাঙ্গা "শালগ্রামের" দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে সামান্য বেতনের চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়াও তৎবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এবং তাঁহারা ওমেদারের বেশে প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, এমন কি, সামান্য জমীদারের সেরেস্তায় ও (উত্তর গোগৃহ দিনাজপুর) অতিক্রম করিয়া যমালয়সদৃশ পার্ব্বত্য

জঙ্গলময় প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। কোন অফিষে দশ টাকা বেতনের একটি কার্য্য খালি হইলে, অমনি, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও রাশি রাশি প্রশংসা পত্রসহ বোঝা বোঝা দরখাস্ত পড়িতেছে। আর সে দিন নাই, কাল নাই, উচ্চশিক্ষার সে মান-মার্য্যাদা ও সমাদর নাই, এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই ষ্টেসনারী দোকান, কাপড়ের দোকান এবং অন্যান্য দোকান করিতে বসিয়াছেন। "সেই এক দিন আর এই এক দিন"। ক্রমশঃ দেশের আরও যে কিরূপ ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই জানেন।

সংস্কৃত ভাষা।

অতি প্রাচীন সময়ে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ দেশে অধ্যয়ন করিয়া উপাধী গ্রহণ জন্য মিথিলা গমন করিতেন। যৎকালে সেই ক্ষণজন্মা স্বর্গীয় রঘুনাথ শিরোমণি উপাধী গ্রহণ জন্য মিথিলা গমন করেন, তখন তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে,"ভবিষ্যতে এদেশীয় লোকের উপাধী গ্রহণ জন্য আর মিথিলা যাইতে না হয়, আমি নিশ্চয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিব"। রঘুনাথ মিথিলা গমন করিয়া পক্ষধর মিশ্রের টোলে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি "শিরোমণি" উপাধী লাভ

করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ একটী টোল খুলিতে অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু রঘুনাথের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। সামান্য দুইখানি কুঁড়ে ঘর ভিন্ন তাঁহার বাটীতে অন্য ঘর ছিল না। এজন্য তিনি হরিঘোষ নামক এক গোয়ালার গোহালঘরে একটী টোল খুলিলেন। অল্পদিন মধ্যে তাঁহার টোলে এত ছাত্র জুটিল যে, সর্ব্বদাই মহাকলরবে সে ঘরখানি পরিপূর্ণ থাকিত। এখনও লোকে কথায় বলে 'হরি ঘোষের গোহাল।'

সেই হইতেই অত্র দেশীয় পণ্ডিতদিগের উপাধী-গ্রহণ জন্য আর মিথিলা গমন না করিয়া নবদ্বীপেই উপাধীগ্রহণ করিবার নিয়ম প্রচলিত হইল। রঘুনাথ এই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া দেশীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর বিলক্ষণ সুবিধা করতঃ স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের বর্ণিত সময়ে, দেশীয় পণ্ডিতগণ দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধ্যয়ন করিয়া তৎপর নবদ্বীপ গমন করতঃ উপাধী গ্রহণ করিতেন। এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এক একটী টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। ছাত্রগণ অধ্যাপক মহাশয়ের বাটীতেই থাকিতেন। তাঁহাদের আহারের ব্যয় অধ্যাপক মহাশয় নির্ব্বাহ করিতেন। তখন পণ্ডিতদিগের আয়; শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিমন্ত্রণ ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিগণ পূজার সময় পণ্ডিতদিগের কিছু কিছু বার্ষিক ও অন্যান্য সময়েও কিছু কিছু প্রণামী প্রদান করিতেন।

অধ্যাপকগণ প্রাতেঃ ও অপরাহ্লে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন।

ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, প্রভৃতি গ্রন্থ টোলে পড়া হইত। কিন্তু বৎসরের বার মাসের মধ্যে প্রায় ছয় মাস কাল, পাঠ বন্ধ থাকিত। অমাবস্যা, প্রতিপদ, ত্রয়োদশী, দেবগর্জ্জন, অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ, অধ্যাপকের অসুখ ইত্যাদি কারণে পাঠ বন্ধ থাকা দেখা যাইত। সুতরাং একজনে আট দশ বৎসর পাঠ করিয়া স্মৃতিগ্রন্থ সমাপন করিতেন। কেহ কেহ বা আট নয় বৎসর পর্য্যন্ত ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে আট-দশ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সকলেই সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু শাস্ত্র শেষ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যে গ্রন্থ-খানি পাঠ করিতেন, সে গ্রন্থখানি তাঁহাদের এককালীন বিশেষ-রূপে কণ্ঠস্থ থাকিত। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষা বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। তৎপর সংস্কৃত ভাষার প্রতি দয়াবান গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত হওয়াতে বর্ত্তমান সময়ে দেশে সংস্কৃতভাষার বিশেষ চর্চ্চা হইতেছে। এক্ষণ দয়াবান গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উপাধী দান ও অধ্যাপকদিগকে কিছু কিছু পুরস্কার প্রদান করতঃ দেশীয় লোকদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। তখন পণ্ডিতেরা তর্কভূষণ, তর্করত্ন, ন্যায়পঞ্চানন, বিদ্যালঙ্কার, বাচস্পতি, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি উপাধী-গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বলিতে গেলে দেশে সেই প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বুঝায়।

তখন পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই শাস্ত্রালাপ ও শাস্ত্রচর্চ্চায় লিপ্ত থাকিতেন। বাহ্যিক বিষয়ে ততদূর মনোসংযোগ করিতেন না।

সুতরাং তখন দেশে একটী জনরব ছিল যে, "পণ্ডিতেরা বাহ্যজ্ঞান-শূন্য" অনেক সময়ে তাহার কথঞ্চিৎ প্রমাণও পাওয়া যাইত।

একটী তর্কভূষণ তাঁহার ব্রাহ্মণীর পঞ্চমীর ব্রত করিতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রাহ্মণী! তোমার কোন্ গোত্র?" তাঁহার ব্রাহ্মণী ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনারও যে গোত্র, আমারও সেই গোত্র।" তৎশ্রবণে তর্কভূষণ মহাশয় ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন "সর্ব্বনাশ, সগোত্রে মুণ্ডঃপাত; ব্রাহ্মণী! তুমি পতিত, আমি পতিত, পুত্র কৃষ্ণজীবনও পতিত"—এইরূপ নানাবিধ রহস্য-জনক গল্প সমাজে প্রচলিত আছে।

যদিচ তাঁহাদিগকে সময় সময় এইরূপ বিষয়-জ্ঞানশূন্য দৃষ্ট হইত, কিন্তু তাঁহারা বিলক্ষণ মেধাবী ছিলেন। একদিন স্বনামধন্য মহাত্মা জগদীশ ন্যায়পঞ্চানন, কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে, প্রাতঃস্নান করিতেছিলেন। সহসা দুইজন গোরা ইংরাজিতে কলহ আরম্ভ করিয়া পরিশেষে মারামারি করিল। তৎপর আদালতে নালিশ করিয়া ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়কে সাক্ষী মানিল। শমনপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চানন মহাশয় আদালতে উপস্থিত হইয়া, বিচারপতিকে বলিলেন, "মহাশয়! আমি ইংরাজী ভাষা জানি না, সুতরাং ইহারা যে সকল ইংরাজিতে কথা বলিল, তাহার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু যে সকল শব্দ বলিয়াছে, তাহা আমার স্মরণ আছে; এই বলিয়া তিনি উভয়ের প্রকাশিত সমুদায় ইংরাজী শব্দগুলি আগাগোড়া বিচারপতির নিকট ব্যক্ত করিলেন। বিচার

পতি তাঁহার ঈদৃশ জ্ঞানবত্তার ও স্মৃতিশক্তির পরিচয়-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে যারপর নাই সম্মানিত ও ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

কোন কোন ব্যক্তির শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ থাকিত। কোন এক সময়ে নবদ্বীপ রাজধানীতে একটী পূর্ব্ব দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহাভারত পাঠ করিতেছিলেন। রাজধানীর দ্বার-পণ্ডিত তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার মানসে, তাঁহার পুস্তকের তিন অধ্যায় পাতা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় অধ্যয়ন সময়ে পুস্তকের অপেক্ষা না করিয়া, সেই তিন অধ্যায় মুখে মুখে অধ্যয়ন শেষ করিলেন। তৎপর রাজা সমুদায় বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন।

তাঁহাদের যাদৃশ অসামান্য স্মৃতিশক্তি ছিল, সেইরূপ তাঁহাদের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের ও বক্তৃতাশক্তিরও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইত। একজন ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যানুরোধে একটী সাহা জমিদারের বাটীতে গিয়া, বিফল-মনোরথ হইয়া, একটী পণ্ডিতের নিকট দুঃখ প্রকাশ করায় পণ্ডিত মহাশয় সন্তাপিত-চিত্তে বলিয়াছিলেন "এরা সামান্য লোক" এই কথা শ্রুত হইয়া জমিদারটী ক্রোধচিত্তে সেই পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি আমাকে সামান্য লোক বলিয়াছেন?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাবিপদে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন "বাবু! আমি আপনাকে সামান্য লোক বলি নাই। আমি বলিয়াছি এরা সা—মান্য

লোক" তখন জমিদারটী পণ্ডিত মহাশয়ের অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্টে ক্রোধে পরিত্যাগ করিলেন।

জিলা বগুড়া গবর্ণমেণ্টের এণ্ট্রান্স স্কুলে হরিচরণ চূড়ামণি মহাশয় হেডপণ্ডিত ছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল। একারণ জিলার সকলেই তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সাতিশয় উপস্থিত বক্তা ছিলেন। একদিন কোন একটী উকীলের বাসায় নিমন্ত্রণ উপলক্ষে জিলার সমস্ত উকীল, মোক্তার, আমলা এবং ডিঃ ও মুন্‌সেফ বাবু তথায় উপস্থিত; ইতি মধ্যে চূড়ামণি মহাশয়ও তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মুন্‌সেফ বাবু ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন, "আসুন গোরক্ষক মহাশয়!" ডিঃ বাবুও ঈষৎ হাস্য করিয়া উক্ত কথায় যোগ দিলেন। তৎশ্রবণে চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! ডিপুটিই হউন আর মুন্‌সেফই হউন, প্রথমতঃ এই হাতেই পাস"। তখন সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া চূড়ামণি মহাশয়কে অতি সমাদর করিয়া উপবেশন করাইলেন।

লোকের যেমন রায়, চৌধুরী ও মজুমদার প্রভৃতি উপাধি থাকে, সেইরূপ জিলা কৃষ্ণনগর দীননাথ নামক এক ব্যক্তির পুরুষানুক্রমে (বাঘ) উপাধী ছিল। দীননাথ বাঘ বিশেষ সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। কিন্তু ক্ষণ রাগী থাকায়, সামান্য কারণে এক কালীন ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। এক দিন তাঁহার পিতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি বহুল পণ্ডিতদিগকে বিদায় করিতেছেন, এমন সময়ে একটী পণ্ডিতের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার প্রতি বাঘ

মহাশয়ের ক্রোধের সঞ্চার হইয়া উঠিল। তখন বাঘ মহাশয় ভীষণ রবে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পণ্ডিতকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া অতি নম্র ভাবে ও সহাস্য বদনে বলিলেন "বাবু! সকলের বেলায় দীননাথ, আর আমার বেলায় বাঘ।"

জিলা যশোহর একটী বড় লোকের মাতৃশ্রাদ্ধে অনেক পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিদায় সময়ে পণ্ডিতদিগের নিমন্ত্রণ পত্রী দেখিয়া বিদায় করা হইতেছিল। ঘটনা ক্রমে একটী পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ পত্র খানা পথে হারাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পত্রী দেখিতে চাহিলে পণ্ডিত বলিলেন, আমার পত্রী খানা পথে হারাইয়া গিয়াছে। তখন বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! পয়সার লোভে কিনা করিতে পারেন" বাবুটী পোষ্যপুত্র, পণ্ডিত মহাশয় তাহা জ্ঞাত ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় অমনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবু! পয়সার লোভে লোকে নিজের বাপ পরিত্যাগ করে, পরের বাপকে বাপ বল্‌তে পারে, আর আমার এ মিথ্যা কথাটা বেশী নিন্দার কি হলো?"

এক সময়ে বিক্রমপুর কোন কার্য্য উপলক্ষে একটী বৃহৎ সভায়, একটী পণ্ডিত শ্লোক পড়িলেন :—

"অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘাড়ম্বর।
দাম্পত্য কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

এই শ্লোকটী শ্রবণ করতঃ অমনি অন্য একটী প্রত্যুৎপন্নমতি পণ্ডিত সভাস্থ পণ্ডিতদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

মহোদয়গণ! তবে শুনুন—

মেষ যুদ্ধে নৃপ শ্রাদ্ধে মধ্যাহ্নে মেঘ আগমে।
সাপত্না কলহশ্চৈব লম্বারম্ভে বহু ক্রিয়া।

এই শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া, সভাস্থ সকলেই উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক পণ্ডিত মহাশয়ের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

সে সময় পণ্ডিতদিগের বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি ছিল। নবদ্বীপে একটী পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাকে প্রশ্নচ্ছলে কবিতার এক চরণ বলিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তরচ্ছলে কবিতার অবশিষ্ট চরণ পূর্ণ করিতে পারিতেন। নবদ্বীপাধিপতি গুণগ্রাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহার এই অলোক-সামান্য ক্ষমতা দর্শনে তাহাকে "রসসাগর" উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন। একদিন মহারাজার অন্তঃপুরে রাণীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ সামান্য রকমের কলহ উপস্থিত হয় "দাম্পত্য কলহশ্চৈব" তজ্জন্য রাজা রাণীকে বহুবিধ তিরস্কার করিলে; রাণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে মহারাজাকে বলিয়াছিলেন,"বল বল বল"। মহারাজা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তথায় রসসাগর উপস্থিত। রাজা রস-সাগরকে দেখিবা মাত্র প্রশ্ন করিলেন, "বল বল বল ?

প্রত্যুৎপন্নমতি রসসাগর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন।

"পতির বাক্যে সতীর চক্ষে জল ছল ছল।
বলিতে দিয়াছেন বিধি বল বল বল।"

অন্য একদিন মহারাজা নদীর ধারে গিয়া দেখিলেন, নদীতে ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে। নদীর গর্ভে নৌকার মাঝিরা, বদর

বদর বলিয়া চীৎকার করিতেছে। মহারাজা বাড়ী আসিয়া রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন। রসসাগর "বদর বদর!" অমনি রস-সাগর আরম্ভ করিলেন।

"বড় লোক ছোট হ'লে না যায় কদর।
সদর ভাঙ্গিয়া গেলে অন্দর সদর।
তুফানে পড়িলে নৌকা বদর বদর।"

আর একদিন মহারাজা রসসাগরকে প্রশ্ন করিলেন, নিশীথে প্রকাশে পদ্ম কুমুদিনী দিনে।'

রসসাগর উত্তর করিলেন—

"জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা পলো মনে।
চক্র করিলেন চক্রী চক্র আচ্ছাদনে।
আকাশেতে কাল নিশি উভয়ে না যানে
নিশীথে প্রকাশে পদ্ম কুমুদিনী দিনে।

একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নগর ভ্রমণে গিয়া দেখিলেন, গ্রামের বাহিরে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী বারয়ারী পূজা হইয়া গিয়াছে। উক্ত রক্ষা-চণ্ডী প্রতিমার সিংহ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়,এক গাভী সিংহের খড় টানিয়া খাইতেছে। রাজা গৃহে আসিয়া রসসাগরকে প্রশ্ন করিলেন, রসসাগর! "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর?"

প্রশ্ন করিবা মাত্র রসসাগর উত্তর করিলেন,

মহারাজ! রাজধানী নগর বাহির।
বারয়ারী মা ফেটে হ'লেন চৌচীড়।

ক্রমে ক্রমে খড় দড়ী হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।

তখন নবদ্বীপে আর একটী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর বর্দ্ধমান প্রভৃতি বহুল স্থানে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন, এবং অনেক বাড়ীতেই অতিথি হইতেন। কিন্তু যে বাটীতেই অতিথি হইতেন, সেখানে কাঁচা কলায়ের ডাইল ও একটা আমড়া পাকের উপকরণ পাওয়া যাইত। তজ্জন্য তিনি আমড়ার বর্ণনা করিয়াছিলেন।

"ওরে সাধের আমড়া,
যেখানে সেখানে যাই, অনায়াসে তোরে পাই,
খেজুরের বড ভাই, আঠি আর চামড়া।"

পূর্ব্ব বঙ্গের একটি পণ্ডিত নবদ্বীপ জগন্নাথ ন্যায় পঞ্চাননের বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন। পঞ্চানন তাঁহাকে পাক করিবার জন্য তণ্ডুল ও একটী বেগুণ দিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সেই বেগুণটি দগ্ধ করিয়া আহার সমাধা করিলেন। তৎপরে ন্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়! আহার কেমন হইল? তখন সেই পণ্ডিত অমনি বার্ত্তাকুর বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

"কৃমি সংযুক্ত বার্ত্তাকু, স্নিগ্ধ মূষ কোষঃ সমঃ।
পঞ্চানন গৃহ ক্রান্তা সক্রান্তা হুতাশনঃ।

তখন এইরূপ বিবিধ ক্ষমতাশালী বহুল পণ্ডিতগণ সমাজে বাস করিতেন। এবং উঁহাদের এতাদৃশ বহুবিধ গল্প সমাজে প্রচারিত আছে। বাহুল্য প্রযুক্ত অধিক উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

বর্ত্তমানে তাদৃশ গুণশালী পণ্ডিত সমাজে অতি অল্পই দৃষ্টি গোচর হয়। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রঘুনাথ শিরোমণি, জগন্নাথ ন্যায় পঞ্চানন, বাণেশ্বর তর্কভূষণ, তারাকান্ত বিদ্যাভূষণ, ইঁহাদের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ও বহুল শাস্ত্রদর্শী কয়জন পণ্ডিত, বর্ত্তমানে ভারত-মাতার শান্তিময় প্রশান্ত ক্রোড়ে বিরাজমান আছেন ?

কবিরাজী শিক্ষা।

তৎকালে দেশে বৈদ্য বংশীয় বহুল ব্যক্তি প্রথমতঃ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ক্রমশঃ নিদান, সুশ্রুত ও চরক প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার জন্মিলে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিতেন। বৈদ্যবংশজ বহুসংখ্যক ব্যক্তি সুচিকিৎসা প্রভাবে দেশে যারপর নাই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ! মুরশিদাবাদ খ্যাতনামা গঙ্গাধর সেন, কলিকাতা সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, বিনোদি লাল সেন, দ্বারকানাথ গুপ্ত, জিলা রাজসাহী নাটোর ঈশ্বরচন্দ্র সেন প্রভৃতি যশস্বী কবিরাজগণ চিকিৎসা দ্বারা অসীম যশ লাভ করিয়া গিয়াছেন। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের, বহুল দুরারোগ্য ও উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি জীবনের আশায় নৈরাশ হইয়াও তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণে সম্যকরূপে আরোগ্য লাভ করিতেন। এতৎভিন্ন তখন দেশের নানা স্থানে

বহুল লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ চিকিৎসা দ্বারা বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেশীয় পাঁচন ও শাস্ত্রীয় তৈল, ঔষধ ব্যবহারে রোগীদিগকে আরোগ্য করিতে দেখা যাইত।

বৈদ্য বংশীয় ব্যতীত তখন ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং অন্যান্য বংশীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তিকেও সুচিৎসাদ্বারা দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দৃষ্ট হইত। জিলা বরিশাল বার্থি-নিবাসী ভৈরবচন্দ্র শীল এক জন প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার বিশেষ একটি ক্ষমতা ছিল যে, তিনি রোগীর হাত দেখিয়া কি কুপথ্য সেবনে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কখন রোগীর মৃত্যু হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন। তাঁহার এই অসামান্য ক্ষমতা দর্শনে তখন দেশের লোকে কেহ বলিতেন তাঁহার মনসা সাধন আছে, কেহ কেহ বলিতেন, তাঁহার ভূতসিদ্ধ আছে এবং কেহ কেহ বলিতেন, তাঁহার দৈবশক্তি আছে; কিন্তু কোন্ শক্তি প্রভাবে তাঁহা দ্বারা এইরূপ অলৌকিক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা ভগবানই জানেন।

উল্লিখিত সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কবিরাজগণ শাস্ত্রোক্ত বহুবিধ অকৃত্রিম ঔষধ সকল প্রস্তুত করিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতেন। তাঁহারা শাস্ত্রসম্মত স্বল্প বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, মধ্যমনারায়ণ, ষড়বিন্দু প্রভৃতি তৈল এবং মকরধ্বজ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, মহা-মৃত্যুঞ্জয়, কস্তুরী ভৈরব, মহারাজ নৃপবল্লভ ও কামেশ্বর, জিরকাদি বিবিধ প্রকারের মোদক প্রস্তুত ও নানাবিধ পাচনের ব্যবস্থা করিয়া দেশীয় লোকের চিকিৎসা করিতেন। এবং দেশীয় লোকেও

ঐ সমুদায় ঔষধ সেবনে চিরস্বাস্থ্য সম্ভোগ করতঃ স্বচ্ছন্দে আজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

এইরূপ ভাবে বহুকাল পর্য্যন্ত সেই অসীম ফলপ্রদ কবিরাজি চিকিৎসাই দেশে প্রচলিত ছিল। এবং দেশীয় লোকে কবিরাজি চিকিৎসা প্রভাবে চির স্বাস্থ্য ভোগ করিয়াছেন। তৎপর দেশে কিছুদিন পর্য্যন্ত কবিরাজি চিকিৎসার ঘোরতর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। কবিরাজি চিকিৎসায় কোন উপকার দর্শন না করিয়া দেশীয় লোকের তৎপ্রতি বিদ্বেষ ভাব জন্মিল। তাহার প্রধান কারণ, কবিরাজদিগের যত্নের অভাব ও স্বার্থপরতা। অর্থাৎ অনেক কবিরাজেরা অর্থাভাব বশতঃ ঔষধ প্রস্তুত সময়ে "সোণার পরিবর্ত্তে তামা, মুক্তার বিনিময়ে দস্তা এবং হাজার পুটি লৌহের অভাবে দুই চারি দশ পুটি লৌহ, এবং একটী দ্রাব্যর অনাটন হইলে অন্য একটা দ্রব্যের দ্বিগুণ মাত্রা ও প্রদানপ্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ উপায় অবলম্বন দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করায় কবিরাজের ঔষধের উপকারিতা. ক্রমশঃ লাঘব হইয়া আসিল। সুতরাং কবিরাজি চিকিৎসার প্রতি লোকের ঘৃণা ও অবিশ্বাস হইয়া দাঁড়াইল। জিলা ঢাকা সাভার-নিবাসী বিখ্যাত গুরুচরণ কবিরাজ শাস্ত্রসম্মত আদি ও অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রোক্ত ঔষধের কথঞ্চিৎ গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

তৎপর বহুদিন গত হইল, কলিকাতা প্রসিদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অভিজ্ঞ বিজয়রত্ন সেন এবং অন্যান্য স্থানে বহুল লব্ধ-

প্রতিষ্ঠ কবিরাজগণ বিবিধ প্রকারের আদি ও অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত করিয়া, দেশে প্রচলন করায় কবিরাজি চিকিৎসার কিছু কিছু উন্নতি দৃষ্ট হয়। এবং দেশীয় লোকের দেশীয় চিকিৎসার প্রতি কিছু কিছু ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। কিন্তু প্রায় পনর আনা লোকেরই বিদেশীয় চিকিৎসার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস দৃষ্ট হয়।

কিন্তু তৎকালে উল্লিখিত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও বহুদর্শী কবিরাজ ব্যতীত, দেশে বহু সংখ্যক "হাতুড়ে কবিরাজেরা চিকিৎসা ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাহাদের মা সরস্বতীর সহিত সামান্য পরিচয় ভিন্ন বিশেষরূপ দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। এবং তাহারা চিকিৎসা শাস্ত্রের মলাট খানা পর্য্যন্ত কখনও দৃষ্টি করে নাই। তখন 'প্রাণকৃষ্ট ঔষধাবলী' নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সামান্য পুস্তক প্রকাশিত ছিল। উহাতে কিছু কিছু চিকিৎসা প্রণালী ও সামান্য সামান্য মুষ্টিযোগ, প্রভৃতি উল্লেখ থাকাতে উক্ত খোট আখুঁরে বিদ্যাবাগীশেরা, উক্ত প্রাণকৃষ্ট ঔষধাবলী, পাঠ করিয়াই দেশে কবিরাজ হইয়া বসিতেন। কোন কোন বিদ্যাদিগ্‌গজ, একটী প্রসিদ্ধ কবিরাজ বাটী থাকিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত কবিরাজ মহাশয়ের তামাক সাজিয়া ও ঔষধের গাছ গাছড়া কুড়াইয়া একটী ঔষধের পোটলা বান্ধিতে পারিলেই কবিরাজ হইয়া দাঁড়াইতেন। স্থূল ঔষধ প্রস্তুত করিতে শিখিলেই তিনি ব্যবসা আরম্ভ করিতেন। ঐ সকল কবিরাজদের কষা ঔষধ প্রয়োগ করাই ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন ছিল। কোন কোন স্থলে

কথা ঔষধের (বিষ) প্রয়োগের ফলে রোগীর সৌভাগ্য ক্রমে রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই রোগীকে যম রাজের অতিথিশালায় অতিথি সৎকার গ্রহণ করিতে দেখা যাইত। তখন সমাজে একটী শ্লোক প্রচারিত ছিল যথা :—

"শত মারি ভবেৎ বৈদ্য সহস্র মারি চিকিৎসকঃ।"

উল্লিখিত যম শঙ্কর কবিরাজদের হাতে বোধ হয় দুশ পাঁচশ হাজার দু হাজার প্রাণী হত্যা হইয়াছে। তৎকালে জনৈক মনস্বী ব্যক্তি একটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সমাজের লোকে অতি আমোদের সহিত ঐ কবিতাটী পাঠ করিতেন যথা :—

"কবিরাজ কপিশ্রেষ্ঠ, যম রাজ সহোদর ;
যম রাজ হরে প্রাণ কবিরাজ ধন প্রাণঃ।"

যাহা হউক ঐ সকল হাতুড়ে, কবিরাজদের বিদ্যা বুদ্ধির ততদূর দৌড় না থাকিলেও, চাসা মহলে বক্তৃতা শক্তি বিশেষ বলবতী ছিল। কয়েকটী কবিরাজের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

একটী কবিরাজ চিকিৎসা উপলক্ষে সর্ব্বদাই চাষা মহলে গমনাগমন করিতেন। বলা বাহুল্য, চাষা মহলেই ইহাদের পশারের আধিক্য দৃষ্ট হইত। তিনি কোন রোগীর বাটী উপস্থিত হইলে, গ্রামের বহু সংখ্যক চাষা তাহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি চাষাগণ পরিবৃত হইয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন। যেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য অসুরগণ পরি-

বেষ্টিত হইয়া পুরাণ পাঠ করিতেছেন। তিনি বলিতেন "বায়ুর নাড়ী পায়। কারণ অধিক পরিশ্রমের পর পা ধুইলেই অমনি শরীর ঠাণ্ডা হয়, কফের নাড়ী গলায়। কেননা সর্দ্দি হইলে গলা দিয়া কফ নির্গত হইয়া থাকে। পিত্তির নাড়ী পেটে কেন না অধিক বেলায় আহার করিলে পেটের মধ্যে পিত্ত জন্মে।" আর একটী কবিরাজের হাতে কোন কঠিন রোগী পড়িলে, আক্ষেপ করিয়া বলিতেন "বাপু হে। কি করি আমার 'রসসিন্দুর' গাছটা গরুতে খেয়েছে, কাজে কাজেই ভাল ঔষধ তৈয়ার করিতে পারিতেছি না, এই সকল যমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কবিরাজেরা ব্যবসা দ্বারা সমাজে দুপয়সা উপায় করিয়াছেন। অধিকাংশই রোগীকেই প্রথমতঃ ইহাদের হাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া, তৎপরে কঠিন হইলে কোন প্রধান কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যাইত। বর্ত্তমান সময়েও পল্লিগ্রাম সমূহে এতাদৃশ হাতুড়ে, কবিরাজের সংখ্যা কমদৃষ্ট হয় না। কিন্তু অনেকেই এক্ষণে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসা করিতেছেন।

ডাক্তারী শিক্ষা।

তৎকালে কলিকাতা মহানগরীতে ডাক্তারী শিক্ষার জন্য বিখ্যাত মেডিকেল কলেজ স্থাপিত ছিল। দেশীয় লোক উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। উক্ত কলেজে বাঙ্গালা ও ইংরাজী দুইটী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাঁহারা

বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ক্লাশে প্রবিষ্ট হইয়া ৪ বৎসর অধ্যয়ন করতঃ নেটিভ ডাক্তার নামে অভিহিত হইতেন। কেহকেহবা স্কুল ইনেস্পেক্‌টর কিম্বা ডিঃ ইনেস্পেক্‌টর অথবা তাদৃশ পদস্থ কোন ব্যক্তির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াও নেটিভ্‌ ক্লাসে প্রবেশ করিতে পারিতেন। এবং ইংরাজীতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করিয়া ইংলিশ ক্লাশে প্রবেশ করার নিয়ম ছিল। তাঁহারা ৫ বৎসর অধ্যয়নের পর এঃ সার্জ্জন পরীক্ষা পাশ করিতেন।

কলেজে সাত আটজন প্রফেসার ও একজন প্রিনসিপাল থাকিতেন। তখন ডাক্তারী শিক্ষার জন্য কোন পুস্তক বাঙ্গালায় মুদ্রিত ছিল না। প্রফেসারগণ বাঙ্গালা ক্লাসে মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। ছাত্রগণ তাঁহাদের বক্তৃতা হাতে লিখিয়া লইয়া অভ্যাস করিতেন। প্রফেসারগণ ঔষধ সম্বন্ধীয়, শরীরসম্বন্ধীয়, অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধীয়, জ্বরাদি সম্বন্ধীয়, ও দ্রব্যগুণ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত সকল পৃথক পৃথক ভাবে বক্তৃতা করিতেন। ক্রমশঃ ডাক্তারী চিকিৎসায় বাঙ্গালা পুস্তক সকল মুদ্রিত হইল। ডাঃ দুর্গাদাস কর প্রণীত "ম্যাটেরিয়া-মেডিকা", ডাঃ গঙ্গাদাস বাবুর ও ডাঃ তামিজ খাঁ প্রণীত "প্রাক্‌টিস্‌ অব মেডিসিন" ডাঃ রামনারায়ণ বাবুর প্রণীত "সার্জ্জরী" এবং অন্যান্য ডাক্তার কর্ত্তৃক অন্যান্য সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল প্রকাশিত হইল।

এনাটমী শিক্ষার জন্য লাশ কাটার আবশ্যক। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীগণ স্বহস্তে লাশ কাটিতে সম্মত না হওয়ায়,

গবর্ণমেণ্টও তৎপ্রতি কোন বিশেষ আগ্রহ করিতেন না। তৎপর একসময়ে অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একটী ছাত্র স্বহস্তে লাশ কাটিতে সম্মত হওয়ায়, প্রিন্সিপাল এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ গবর্ণর জেনারলকে জানাইলেন। যে দিবসে লাশ কাটা হয়, সেইদিনে, ছোটলাট, বড়লাট এবং অন্যান্য বহুল উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষগণ মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গালী ছাত্রটী লাশ কাটিলেন। চতুর্দ্দিকে মহা আনন্দধ্বনি উঠিল। কেল্লায় ব্যাণ্ড বাজিল। গুড়ুম গুড়ুম করিয়া একুশ তোপ পড়িল। অনতিবিলম্বে এই সংবাদ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইল। সেই হইতেই বাঙ্গালিদের লাশ কাটিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। তখন ডাক্তারী শিক্ষায় একটী বিশেষ সুবিধা ছিল। কারণ ডাক্তারগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই, গবর্ণমেণ্টের পুলিষ হস্‌পিটালে, জেল হস্‌পিটালে ও দাতব্য-চিকিৎসালয়ে চাকুরী পাইতেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন কার্য্যে নিযুক্ত না হইতেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বেতন দেওয়ার নিয়ম ছিল। ক্রমশঃ ডাক্তারীশিক্ষায় বহুসংখ্যক লোক পাশ হওয়ায়, সে নিয়ম রহিত হইয়া গেল। ক্রমশঃ ডাক্তারগণ আর গবর্ণমেণ্টের চাকুরি না পাইয়া নিজে ব্যবসা খুলিতে লাগিলেন। প্রত্যেক জেলা, মহকুমা হাট বাজারে, এমন কি, গ্রামে গ্রামে ডিস্‌পেন্‌সারি খুলিয়া তাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকিলেন।

বহুকাল পর্য্যন্ত মেডিকেল কলেজ হইতেই নেটিভ ও এঃ সার্জ্জন ডাক্তারেরা পাশ হইতেছিলেন। তৎপর ১২৮০ সনে বাঙ্গালার

ছোটলাট মহামতি ক্যাম্বেল সাহেব বাহাদুর, উক্ত নিয়ম রহিত করিয়া মেডিকেল স্কুলের প্রথা সৃষ্টি করিলেন। অর্থাৎ নেটিভ ডাক্তারেরা স্কুলে শিক্ষা করিবেন এবং এঃ সার্জ্জনেরা মেডিকেল কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। শিয়ালদহ এবং ঢাকা এই দুই স্থানে দুইটী মেডিকেল স্কুল সংস্থাপিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে নেটিভ ডাক্তারেরা উক্ত উভয় স্কুলে শিক্ষা করিয়া নেটিভ ডাক্তারি পাশ করিতেছেন।

সে সময়ে যেমন "হাতুড়ে" কবিরাজেরা ব্যাবসা দ্বারা" দুই পয়সা উপায় করিতেন। সেইরূপ বহু সংখ্যক "আনাড়ী" ডাক্তর বাবুরাও দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছিলেন। অনেকে দুই এক বৎসর ডাক্তারি শিক্ষা করিয়া কেহ কেহ বা কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন একটি সরকারী হস্‌পিটালে কিম্বা কোন একটী ডাক্তারের নিকট কম্পাউণ্ডারি করিয়া,তৎপর একটি সুবিধা জনক স্থানে ডিস্‌পেন্‌সারী খুলিয়া বসিতেন! তাঁহারা কিছু কিছু ঔষধ সংগ্রহ করিয়া, একখানি গৃহে কয়েকটি আলমারি, একখানি টেবিল ও চেয়ার সাজাইয়া ব্যবসা খুলিতেন। তখন দেশে ঐ সকল যমদূত সদৃশ ডাক্তার বাবুদেরও যথেষ্ট আদর ছিল। তাঁহারা সুচিকিৎসা প্রভাবে বহু সংখ্যক নরহত্যা করিয়া ও ব্যবসার দোহাই দিয়া দণ্ডবিধি আইনের অপরাধ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতেন। প্রায় ৪০। ৪৫ বৎসর পুর্ব্বে "ডাক্তার বাবু" নাটক নামে একখানি নাটক প্রকাশিত হয়। ঐ নাটকে উক্ত ডাক্তার বাবুদের কীর্ত্তি-কাহিনী বিশেষ রূপে উল্লেখ রহিয়াছে,

এবং উক্ত নাটকে একটী পদ্য লিখিত ছিল, যথাঃ—

"খুন করে না পড়ি ধরা ঐ সুখেইত ব্যবসা করা"। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে উল্লিখিত আনাড়ি ডাক্তারদের অন্ন উঠিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ডাক্তারগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে আর ব্যবসা করিতে পারিবেন না।

সে সময়ে যেরূপ বহুবংথক আনারী ডাক্তার সকল সমাজে ব্যবসা করিতেন, সেইরূপ সরকারী ডাক্তার থানায় এবং অনেক ডাক্তারদের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বহুসংথক আনাড়ী কম্পাউণ্ডারেরাও কার্য্য করিত।

মহকুমা নাটোর সরকারীডিস্‌পেন্‌সারীতে একটি কম্পাউণ্ডার ছিল। তাহার কোন পুরুষেও বর্ণ পরিচয়ের মুখ দেখে নাই। কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত সে কম্পাউণ্ডারী করিয়া আসিতেছে। সে আন্দাজে ঔষধের শিশিগুলি ঠিক করিয়া রাখিত। এবং ডাক্তার বাবু প্রিস্ক্রিপ্‌সন্‌ করিয়া ঔষধ বলিয়া দিলে সে তাহা স্মরণ করিয়া রোগীকে সেই ঔষধ বিতরণ করিত। একদিন একটী জ্বরের রোগী ও একটী কাশির রোগী এক সঙ্গে হস্‌পিটালে উপস্থিত হইলে, ডাক্তার বাবু জ্বরের জন্য ফিভার পাউডার,ও কাশির জন্য পৃথক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া কম্পাউণ্ডারকে বলিয়া দিলেন। উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার এক ফিভার পাউডার প্রস্তুত করিয়া উভয়কেই প্রদান করিল। দুই জনেরই ঔষধ সেবন করায় দাস্ত আরম্ভ হইল। কাশির রোগীটার দাস্ত হইয়া কাশী-প্রাপ্তির যোগাড় হইয়া উঠিল। তৎপর ডাক্তার

আসিয়া নানাবিধ ঔষধ প্রদানে রোগীর প্রাণ রক্ষা করিলেন।

জিলা বগুড়া একটী সরকারী সিভিল সার্জ্জনের ঐরূপ একজন হাতুড়ে কম্পাউণ্ডার ছিল। এক দিন একটি বেদনার রোগীর নিদ্রাকর্ষণ জন্য ডাক্তার সাহেব উক্ত রোগীর নিমিত্ত $\frac{1}{8}$ গ্রেণ মর্ফিয়া ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কম্পাউণ্ডার $\frac{1}{8}$ গ্রেণ স্থলে রোগীকে ৮ গ্রেণ মর্ফিয়া দিল। রোগী সেবন মাত্র একজনের মত সমুদায় রোগ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। তখন সমাজে এইরূপ বহুসংখ্যক গণ্ডমূর্খ কম্পাউণ্ডার দৃষ্ট হইত। কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের আদেশে কম্পাউণ্ডারগণের পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম হওয়ায়, উক্ত গণ্ডমূর্খ কম্পাউণ্ডারগণ আর সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বহুকাল হইতে জিলা বরিশাল রামসিদ্ধির চিকিৎসকেরা ক্ষত রোগের চিকিৎসায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন। জনপ্রবাদ তাঁহাদের প্রতি মনসা দেবীর একান্ত অনুগ্রহ আছে। তাঁহারা মনসা পূজার দিবস সম্বৎসরের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের গুল ও কাইট, এই দুই প্রকার ঔষধ আছে। তদ্দ্বারা তাঁহারা ক্ষত রোগের চিকিৎসা করেন। তৎভিন্ন তাঁহারা অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করেন না। তত্রত্য পদ্ম ডাক্তার ও রামচন্দ্র ডাক্তার,মোহন ডাক্তার প্রভৃতি ক্ষত রোগের চিকিৎসায় অদ্বিতীয় ছিলেন। অনেক সময়ে সিবিলসার্জ্জনেরাও ক্ষত চিকিৎসায় তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন। অদ্যাপি তাঁহাদের

বংশধরগণ ক্ষত চিকিৎসায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মেডিকেলস্কুলে ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন।

জিলা ঢাকা ষোলঘরের চক্ষু রোগের চিকিৎসকগণ বহুকাল হইতেই দেশে যশস্বী রহিয়াছেন।

তৎসময়ের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গবাসীগণের ইংলণ্ডে গমন করিয়া, সিভিল সার্জ্জন পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম ছিল। তখন সিভিল সার্জ্জন স্বর্গীয় গুডিব চক্রবর্ত্তী, ডি, এন, বসু, কে, ডি, ঘোষ মহাত্মাগণ চিকিৎসা ব্যবসায়ে যারপর নাই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। এমন কি, ইংলণ্ডীয় চিকিৎসকগণও চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট পরাস্ত স্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ ভোলানাথ বসু মৃত্যুকালে দেশহিত-কর কার্য্যে বহুল অর্থ দান করিয়া বঙ্গভূমে স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

গুডিব চক্রবর্ত্তী অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী। তিনি একটি বাসায় রন্ধন করিতেন এবং বেতনের পরিবর্ত্তে তাঁহার মেডিকেল কলেজের পড়ার খরচ প্রাপ্ত হইতেন। তখন মহামতি মেঃ গুডিব সাহেব মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীর প্রখর বুদ্ধি দর্শনে মেঃ গুডিব সাহেব ইংলণ্ড গমন কালীন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তিনি সিভিল সার্জ্জন পরীক্ষায় পাশ হন। এবং গুডিব সাহেব তাঁহাকে সন্তানের মত ভাল বাসিতেন। পক্ষান্তরে তিনিও তাঁহাকে পিতার ন্যায়

ভক্তি করিতেন, তজ্জন্য তিনি "গুডিভ" নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করেন। সমুদায় ইউরোপীয়ান তাঁহাকে একান্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। বঙ্গভূমে তিনি একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারি অনেক পুস্তকে তাঁহার মতামত উল্লেখ আছে।

ক্রমশঃ বহুসংখ্যক ব্যক্তি এম-বি ও এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও দেশীয় বহুল খ্যাতনামা সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার দেশে চিকিৎসা দ্বারা বিশেষ প্রশংসা লাভ করিতেছেন।

তখন ইংলণ্ডীয় বহুসংখক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারগণ বঙ্গভূমে অপরিসীম যশঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ ফেরার অস্ত্র চিকিৎসায় অদ্বিতীয় ছিলেন। ডাঃ সিম্‌সন ঢাকাতে ছিলেন; তিনি কলেরা চিকিৎসায় অনির্ব্বচনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ডাঃ কেলি চক্ষু রোগের চিকিৎসায় বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান সময়েও বহুল খ্যাতনাম্না ইংলণ্ডীয় ডাক্তারগণ বঙ্গভূমে অবস্থান করিতেছেন।

স্ত্রী-শিক্ষা।

আমাদের বর্ণিত সময়ের বহুকাল পূর্ব্বে পরম বিদ্যোৎসাহী স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়, এই তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গভূমে প্রথমতঃ

শিক্ষার পবিত্রালোক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি বহুল যত্ন ও চেষ্টা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা মহানগরীতে ইংরাজি ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত করিয়া বঙ্গবাসীর শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করেন। কিন্তু তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না, সুতরাং তিনি দেশে বহুবিধ শিক্ষা প্রণালীর উপায় উদ্ভাবন করিয়াও স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে কোন যত্নই করেন নাই। মনস্বী ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করিতেন বটে; কিন্তু তিনিও গৃহে শিক্ষা ব্যতীত স্ত্রী-শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় সংস্থাপন করা আবশ্যক বোধ করিতেন না। একারণ তৎসময়ে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় নাই। সুতরাং দেশে স্ত্রী-শিক্ষার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত ছিল না। বিশেষতঃ তখন দেশের লোক স্ত্রী-শিক্ষার ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন।

তৎকালে দেশের লোক স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তি প্রদান করিতেন। কেহ কেহ বলিতেন, স্ত্রীদিগের লেখা পড়ার প্রয়োজন কি? তাহারা কি চাকুরী করিবে? কেহ কেহ বলিতেন, স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিখিলে, তাহাদের চরিত্র কলুষিত হইয়া থাকে; কেহ কেহ বলিতেন, স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়। কিন্তু সেই সমুদায় কুসংস্কারাপন্ন ও স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা স্বর্গীয়া খোনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী এবং বিশ্ববরা প্রভৃতি পবিত্র-হৃদয়া রমণীগণের কথা একবারও স্মরণ করিতেন না। যাহা হউক, অন্যান্য যুক্তি অপেক্ষা শেষোক্ত যুক্তিটি অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা

বালিকাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে দিতেন না। এবং দেশীয় রমণীগণও তৎবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিমুখী ছিলেন।

যদিচ তখন মহিলাগণের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না, কিন্তু শিল্পাদি কার্য্যের বিশেষ প্রচলন ছিল। রমণীগণ বাল্যকাল হইতেই, নানাবিধ লতা, পাতা ফুল ও জীবজন্তুর আকৃতি পরিশোভিত কাঁথা, বেঠন সেলাই, পট চিত্র, মাটির খেলনা প্রস্তুত এবং রন্ধনাদি কার্য্য অতি আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেন। এবং পিতা মাতা ও অন্যান্য পরিজনবর্গ ও বালিকাদিগকে ঐ সকল কার্য্য, বিশেষতঃ রন্ধনাদি শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

কালের পরিবর্ত্তনানুসারে ক্রমশঃ দেশীয় লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি দেশের লোকের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষিত হইতে লাগিল। স্ত্রীশিক্ষার স্রোত মন্দ মন্দ গতিতে বঙ্গভূমে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বালিকাগণ গৃহে বসিয়া লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। অনেকেই স্বীয় যত্নে বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা ও শিশুবোধক প্রভৃতি পুস্তক পাঠ সমাপন করতঃ পরিশেষে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতে শিখিলেই বিদ্যা শিক্ষার চরম সীমা মনে করিতেন। এবং সমাজেও তিনি বিশেষ যশস্বিনী হইতেন।

ক্রমশঃ বঙ্গভূমে স্ত্রীশিক্ষার স্রোত অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিল। স্ত্রীশিক্ষার সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বহু-সংখ্যক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর গত হইতে চলিল, নব্যভারত পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বাবু

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় কলিকাতায়, "ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা" নামক একটী সভা স্থাপিত করিয়া ফরিদপুরের অন্তঃপুর, মহিলাগণের শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিলেন। সুহৃদ্ সভার সভাগণের যত্নে ফরিদপুরের রমণীগণ বিশেষ রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

উত্তরোত্তর স্ত্রীশিক্ষার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সমগ্র ভারত-ভূমে প্রকাশিত হইল। স্ত্রীশিক্ষার পবিত্র প্রভায় সমুদায় ভারত-ভূমি আলোকিত হইয়া উঠিল। বঙ্গমহিলাগণ নানাবিধ সংবাদ-পত্র ও পুস্তক সকল প্রণয়ন করিতে শিখিলেন। তাঁহারা ইংরাজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে থাকিলেন। পরম উৎসাহশীলা শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রথমতঃ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া বঙ্গভূমে স্ত্রীশিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ, শ্রীমতী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সরোজিনী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দাস প্রভৃতি মহিলাগণ ধাত্রী-শিক্ষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করায়, দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিল। তদ্ভিন্ন বহুল বঙ্গমহিলাগণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

প্রায় ৪০ বৎসর গত হইল, পশ্চিম দেশীয়া কুমারী রমা বাই বঙ্গভূমে আগমন করিয়া স্বীয় সুশিক্ষার পরিচয় প্রদান করতঃ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি মুখে মুখে পাঠ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্টে দেশের লোক শত মুখে তাঁহার

প্রশংসা করিতে থাকিলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। তিনি এদেশে আসিয়া বিবাহিতা হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অল্প দিন মধ্যেই বিধবা হইলেন।

এইরূপে দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথা সম্যকরূপে প্রচলন হইয়া উঠিল। দেশের লোক বদ্ধপরিকর হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন। কলিকাতা ও মফঃস্বল জিলা সমূহে এবং প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গবর্ণমেণ্ট হইতে বালিকা বিদ্যালয় খোলা হইতে লাগিল। প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হইয়া স্কুলের রমণীদিগকে শিল্প শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষার চরম সীমা বঙ্গভূমে প্রকাশ পাইল। পাঠক! আমাদের বর্ণিত সময়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে দেশের অবস্থা যে আকাশ পাতাল সদৃশ বিভিন্ন অনুভব হইবে, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে বঙ্গবাসীগণ তৎকালে স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন, আজ সেই বঙ্গবাসীগণ স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী। যে বঙ্গবাসীগণ এক দিন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতই ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করিতেন, আজ সেই বঙ্গবাসীগণ শত মুখে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করিতেছেন। যে বঙ্গমহিলাগণ তৎসময়ে কেবল মাত্র গৃহ পরিষ্কার তৈজষাদি মার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, আজ সেই বঙ্গললনাগণ ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়া, স্বদেশে ও বিদেশে গমন পূর্ব্বক স্বীয় তেজস্বিনী বক্তৃতা প্রভাবে ভূয়ঃসী প্রশংসাবাদ গ্রহণ করিতেছেন। আজ সেই বঙ্গমহিলাগণ

কত কত পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রণয়ন করতঃ অজস্র ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইতেছেন। আজ সেই বঙ্গনারী জ্ঞান বলে, শিক্ষা বলে সুসভ্যদেশের শিক্ষিতা রমণীগণের উচ্চাসন অধিকার করিতেছেন। আজ সেই বঙ্গরমণীগণের সুশিক্ষা দর্শন করিয়া সেই প্রাতঃ স্মরণীয়া লীলাবতী, খণা, বিশ্ববরা প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণের কথা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্পষ্টাক্ষরে জাগরুক হইতেছে। বঙ্গ বাসীগণের ঈদৃশ যত্ন ও উৎসাহ বলে এই পবিত্র বঙ্গভূমে যে ক্রমশঃ স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পাইবে, একথা কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

নাম-শ্লোক শিক্ষা।

তখন সমাজে নাম শ্লোক শিক্ষার পদ্ধতি বিশেষ প্রবল ছিল। সন্ধ্যার পর বাটীর প্রাচীন"ঠাকুরদাদা মহাশয়"সমুদায় বালকগণকে একত্রিত করিয়া আপন নাম ও পিতা, পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি সাতপুরুষের নাম, কুলীনের লক্ষণ, কায়স্থের লক্ষণ, এবং বহুবিধ শ্লোক শিক্ষা দিতেন। তখন কোন স্থানে গমন করিলেই আপন নাম, পিতার নাম, পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করার নিয়ম ছিল। তাহাতে কোনরূপ অসভ্যতা প্রকাশ পাইত না। বরং সেটী সভ্যতার লক্ষণ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পিতা, পিতামহের নাম দূরের কথা, স্বীয় নাম জিজ্ঞাসা করার নিয়মও রহিত হইয়াছে। নাম জিজ্ঞাসা করাটা এক্ষণ অত্যন্ত অসভ্যতার কার্য্য মধ্যে পরি-

গণিত। একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছি, কিন্তু তাহার নাম জিজ্ঞাসা করা নীতি-বিরুদ্ধ। নিতান্ত দরকার হইলে, "অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই বাবুটীর নাম কি ?" ধন্য সভ্যতা, 'বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছে !!

এতৎভিন্ন তখন নাম-শ্লোকের বিচার হইত। কোন নিমন্ত্রণের বাটী কিম্বা বিবাহের সভায়, বালকগণের নাম-শ্লোকের বিচার করার একটা প্রথা ছিল। বালকগণ দুইদল হইয়া দুইদিকে বসিত। উভয় দলের মধ্যে একজন মুখপাত্র হইয়া সন্মুখে থাকিত। তাহার পক্ষীয় আর ৮।১০ জন বালক তাহার পশ্চাতে থাকিয়া সাহায্য করিত। এইরূপে বালকগণের বিচার আরম্ভ হইত। প্রাচীন ব্যক্তিরা অতীব উৎসাহের সহিত, বিচার শ্রবণ করিতেন।

বিচারের এইরূপ পদ্ধতি ছিল যথা :—

প্রথম পক্ষ। আপনার নাম কি ?

দ্বিতীয় পক্ষ। "জিজ্ঞাসিলে আমার নাম কহিব তা পাছে।
ইন্দ্রের অমরাপুরী পারিজাত আছে।
দিন দশ লক্ষ পুষ্প ধরে সেই গাছে।
এক এক পুষ্পের মূল্য সওয়া মোন সোণা।
চারিযুগেতে পুষ্প কত হয় সোণা।
ইহার নির্ণয় করে দেন মহাশয়।
পশ্চাতে জিজ্ঞাসা করেন যত মনে লয়।

প্রথম পক্ষ। পারিজাত-পুষ্প হয় অমরা ভবনে।
মর্ত্ত্যলোকে তার সংখ্যা করে কোন জনে।

অসম্ভব বাক্য কেন বল মহাশয় ?
ভদ্রভাবে দাও তব নিজ পরিচয়।

দ্বিতীয় পক্ষ। আমার নাম শ্রীশ্যামাচরণ দত্ত।

প্রথম পক্ষ। 'শ্রী' পেলেন কোথায় ?

দ্বিতীয় পক্ষ। পঞ্চমুখে, পঞ্চ নাম পঞ্চ নিয়ে ফিরি।
বাপ মায়্ থুলেন নাম লক্ষ্মী দিলেন শ্রী।

প্রথম পক্ষ। আপনি কাহার পুত্র ?

দ্বিতীয় পক্ষ। শ্রীহরিচরণ দত্ত মহাশয়ের পুত্র।

প্রথম পক্ষ। আপনি যে আপনার পিতার পুত্র
তাহার সাক্ষী কি ?

দ্বিতীয় পক্ষ। শুনহে নির্ব্বোধ তোমার বুদ্ধি কিছু নাই।
পিতার পুত্র হয়ে সাক্ষী চাহ সবাকার ঠাঁই।
আমি বলি ধর্ম্ম বিনা আর সাক্ষী নাই।
যেমন ইংরাজের ঘরে হলে দরকার
ঘরচুরি গেলে যেমন সাক্ষী চাহে তার
তেঁয়ি কি তোমার পিতা মনে ভয় পেয়ে।
তোমায় কি জন্ম দিলেন সাক্ষী সাবুদ লয়ে।

ইহার পর, আপনি কাহার পৌত্র, কাহার দৌহিত্র, নিবাস কোথায় ইত্যাদি পরিচয় লওয়া হইত। (তৎপর)

প্রথম পক্ষ। আপনারা ?

২য় পক্ষ। কায়স্থ।

১ম পক্ষ। কতকাল যাবৎ ?

২য় পক্ষ। যাবৎ মেরু স্থিতি দেবা, যাবৎ গঙ্গা মহীতলে
চন্দ্রসূর্য্য গগনে যাবৎ তাবৎ কায়স্থ কুলে বয়াং।

১ম পক্ষ। কায়স্থের লক্ষণ কি ?

২য় পক্ষ। বিস্তাবন্ত সূচীধীর দাতাচ পরোপকারকং।
রাজসেবা বিপ্রভক্তি কায়স্থের সপ্ত লক্ষণ।

১ম পক্ষ! শূদ্রের লক্ষণ কি ?

২য় পক্ষ। বিপ্র দেখে প্রণাম করে।
শূদ্র শূদ্র বলি তারে।

১ম পক্ষ। কুলীনের লক্ষণ কি ?

২য় পক্ষ। আচার বিনয় বিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপদান নবধাঃ কুললক্ষণং। ইত্যাদি।

ইহার পরই শ্লোকের বিচার আরম্ভ হইত। তখন সমাজে বহুবিধ শ্লোক প্রচারিত ছিল। যথা চাণক্যের শ্লোক, মহানাটকের শ্লোক, বিদ্যাপতির শ্লোক ইত্যাদি সমাজের বালকগণ ঐ সমুদায় শ্লোক যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিত! চাণক্যের শ্লোক বর্ত্তমান সময়েও সমাজে কিছু কিছু প্রচলিত আছে। কিন্তু মহানাটক ও বিদ্যাপতির শ্লোক বর্ত্তমান সময়ে এককালীন বিলুপ্ত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"সখিহে! বিরাট তনয় দেহ দান; বায়সে অজরব, অন্তরে জ্বর জ্বর, কি ভেল পাপ পরাণ; বক্র ষড়ানন, তাঁহার বাহন যেন, তাঁহার ভক্ষ ভক্ষ্য নিজ সুতে; বানধনু শিরে যার, পুরী নষ্ট কৈল তার, হেন দুঃখ প্রিয় দিল মোরে; মান তিনগুণ করি,

বেদে নিশাইয়া পুরি, সেহ সখী একত্র করিয়া, মুই অভাগিনী রামা, বিধি মোর হৈল বাম, প্রাসিব বান ঘুচাইয়াঃ॥ (বিদ্যা-পতি)

"হরচিন্তা লাগিল বড়, পরিজন পোষণ, লাগি হামার ; হামারি পঞ্চমুখ, তাহাতে নাহিক সুখ, কেমনে বাঁচিব ভিখ মাঙ্গি ; পঞ্চানন, ষড়ানন, দুহারি বেটা, ভূত পিশাচ যত, সঙ্গে খায়াল কত, কাহার পেট নাহি ছোটা, মাজাক্ষীণ দেখি তব, হেমগিরি রাজকুমারী, পেট নাহি লুকাওলো রামাঃ। (মহানাটক)

এতাদৃশ বহুল শ্লোক সমাজের ব্যক্তিগণ অভ্যাস ও সর্ব্বদাই শ্লোকের বিচার করিতেন। তখন শ্লোক বিচারের একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল। ১ম পক্ষ যে শ্লোকটী পরিবেন, দ্বিতীয় পক্ষের সেই শ্লোকটীর শেষে যে অক্ষর থাকিবে, সেই অক্ষর আদ্য অক্ষর যুক্ত আর একটী শ্লোক পড়িতে হইবে। অর্থাৎ প্রথম পক্ষের পঠিত শ্লোকের শেষে 'ক' অক্ষর থাকিলে, বিপক্ষ পক্ষের যে শ্লোকের আদ্যাক্ষরে 'ক' থাকিবে, সেই শ্লোকটিই পড়ার নিয়ম ছিল। এইজন্যই তখন অনেকে দুইশত চারিশত শ্লোক অভ্যাস করিতেন। যিনি অধিক সংখ্যক শ্লোক জানি-তেন, তাঁহার সমাজে বিশেষ মর্য্যাদা ও সমাদর ছিল। কোন স্থানে নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে, বালকগণ এতাদৃশ ব্যক্তিকে বহুল যত্ন ও সমাদর করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইত। আমাদের গ্রামে একটী প্রাচীন লোক ছিলেন। তিনি শ্লোকের জাহাজ বলিয়া গ্রামে তাঁহার যৎপরনাস্তি আদর ও সম্মান ছিল। গ্রামের সমস্ত বাল-

কই তাঁহাকে "ঠাকুর দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিত। তিনি জাত্যাংশে নীচ থাকিলেও, কোনস্থানে নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে সকলে আদর করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইত। এবং নায় শ্লোকের বিচার আরম্ভ হইলেই তিনি সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আর সেরূপ শ্লোকের বিচার সমাজে প্রচলিত নাই।

সাঙ্কেতিক ভাষা শিক্ষা।

সে সময়ে দেশে নানাবিধ সাঙ্কেতিক ভাষা প্রচলিত ছিল। দেশের লোকে যত্ন পূর্ব্বক ঐ সকল সাঙ্কেতিক ভাষা শিক্ষা করিতেন। একরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাকে "বরুজ-ঠার" বলিত। বোধ হয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামতি বররুচি ঐ সাঙ্কেতিক ভাষাটী প্রচার করেন, একারণ বররুচি-প্রণীত সঙ্কেত, অপভ্রংশে 'বরুজঠার' বলিয়া উহা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত ভাষাটীর সঙ্কেত নিম্নে প্রকাশ করা গেল যথাঃ—

২১শে ক, ২২শে খ, ২৩শে গ, ২৪শে ঘ, ৩১শে চ, ৩২শে ছ, ৩৩শে জ, ৩৪শে ঝ, ৪১শে ট, ৪২শে ঠ, ৪৩শে ড, ৪৪শে ঢ, ৪৫শে ণ; ৫১তে ত, ৫২তে থ, ৫৩তে দ, ৫৪তে ধ, ৫৫তে ন; ৬১তে প, ৬২তে ফ, ৬৩তে ব, ৬৪তে ভ, ৬৫তে ম; ৭১ র, ৭২ল, ৭৩ শ, ৭৪ হ, ৭৫ ক্ষ। ইত্যাদি।

এই সাঙ্কেতিক ভাষাটী পূর্ব্বে দেশে বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল। অনেকে পত্রাদি লিখিবার সময় ঐ ভাষা ব্যবহার করিতেন। পত্রাদি লিখিতে কোন ব্যক্তির স্পষ্ট নাম না লিখিয়া ৫১ মহাশয় (তারিণীচরণ) ৬১ মহাশয় (পঞ্চানন) যাইতেছেন। কিম্বা পাঠাইবেন, এইরূপ লেখা হইত। কথা বলিবার সময়ও এইরূপ সাঙ্কেতিক ভাষায় অনেকে কথা বলিতেন। একব্যক্তি একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যথাঃ—

২২ অভাবে ২৩ শুকাল ২৪ নাই যে থাকি।

তিন ২১শের এক একুশ ও নাই যে সমাচার লিখি।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, ২১ (ক) ২২ (খ) ২৩ (গ) ২৪ (ঘ) পাঠকগণ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া পত্রখানির অর্থ বুঝিয়া লইবেন। অনেকে কথায় বলিতেন, তিনি ৬১ করেছেন। অর্থাৎ পলাইয়াছেন। অদ্য গৃহে ৫১ নাস্তি অর্থাৎ তণ্ডুল নাস্তি ইত্যাদি। বর্ত্তমান সময়ে উক্তভাষা আর প্রচলিত নাই।

এতদ্ভিন্ন তখন অন্যান্য সাঙ্কেতিক ভাষাগুলিও দেশে ব্যবহৃত ছিল। সকলেই সেই সমুদায় সাঙ্কেতিক শব্দগুলি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। কোনব্যক্তি কাহাকে মুন্সীগিরির সহিত গালি বা উপহাস করিতে উক্ত সাঙ্কেতিক শব্দগুলি প্রয়োগ করিতেন। যথাঃ—

গাবতলা ধারীবোণা (১) শাল গায় দিয়া লালশাক তোলা (২) ছালা পেতে গোল হয়ে বসা (৩) তুমি গাবতলা ধারী বোন, শাল

(১) গাধা, (২) শালা, (৩) ছাগোল।

গায় দিয়া লাল শাক তোল, ছালা পেতে গোল হয়ে বসো ইত্যাদি।

তদ্ভিন্ন কোন বিষয়ের সঙ্কেতে মর্ম্ম প্রকাশ জন্ত নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করা হইত। যথা—

পটল তোলা (১) পলো কেনা (২) শিঙ্গা হাতড়ান (৩) শিঙ্গা ফোঁকা (৪) বেগুন বেচা মুখ (৫) চম্পট দেওয়া (৬) ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তি পলাইয়া গেলে (১, ২, ৬,) শব্দ ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ অমুকে পলো কিনিছে, পটল তুলেছে, চম্পট দিয়াছে। সিঙ্গা হাত্‌রাচ্ছে। সিঙ্গা ফোঁকেছে। বেগুন বেচা মুখ করেছে। ইত্যাদি।

একটী গানের মধ্যে আছে, "জান না মন কোন্ দিন তোমার ভবের পটল তুল্‌তে হবে ইত্যাদি—

একটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সে বাজারে খুব ভাল বাঙ্গলা জানিতেন। একারণ সাহেবের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যেন বাঙ্গালা ভাষায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। তিনি সর্ব্বদাই আত্মগৌরব প্রকাশ করিতেন। এবং সকল সময়েই বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিতেন। একদিন সাহেব তাঁহার সেরেস্তাদারকে বলিলেন। বাবু! আমি ভাল বাঙ্গালা শিখিয়াছি। বাঙ্গালার সকল কথা আমি বুঝিতে পারি। তৎ শ্রবণে সেরেস্তাদার বলিলেন, ধর্ম্মাবতার! আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় অনেক কথা আছে,তাহা আপনি কখনও

(১, ২, ৬) পলাইয়া যাওয়া, (৩) মুমূর্ষাবস্থা, (৪) মরে যাওয়া (৫) কষ্টামুখ।

বুঝিতে পারিবেন না। তাহা শুনিয়া সাহেব অত্যন্ত গর্ব্ব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি সব কথা বুঝিব। তখন সেরেস্তাদার ঈষৎ হাস্য করিয়া সাহেবকে বাঙ্গালার সাঙ্কেতিক শব্দ সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সেরেস্তাদার। বেগুন বেচা মুখ কাকে বলে?

সাহেব। বেগুন বেচিবার কালে যে মুখ।

সে। (হাস্য করিয়া) বলিলেন, তাহা নহে—কষ্টামুখ।

সা। আরও বল, আমি বুঝিব।

সে। পটল তোলা কাকে বলে?

সা। পটল তুলিয়া লওয়া।

সে। তাহা নহে পলাইয়া যাওয়া। ইত্যাদি

উক্ত সাহেব ভাল বাঙ্গালা জানিলেও, তিনি টুমি, টোমার টোম্‌লোক ইত্যাদি শব্দ ছাড়িতে পারেন নাই। এবং গাই বলদ প্রভৃতিও বুঝিতে পারিতেন না। একদিন তাঁহার এজ্‌লাস একটা 'বলদ' গরু হত্যার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, সাহেব ফরিয়াদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "টোমার বলড্‌ কট ডুড ডেয়" এইকথা শুনিয়া মোক্তারেরা হাসিয়া উঠিল। তখন সাহেবও উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,"হঁা হঁা টোমলোক হাসিয়াছে, হামি লোক বুঝিয়াছে, বলড পুরুষ মানুষ আছে ডুড ডেয় না।

বর্ত্তমান সময়েও ঐ সকল সাঙ্কেতিক ভাষাগুলি সমাজে বিস্তর ব্যবহার হইতেছে।

পারসী ভাষা শিক্ষা।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তখন সমাজে পারসীভাষার বিশেষ প্রচলন না থাকিলেও এককালীন বিলুপ্ত হয় নাই। এ কারণ কেহ কেহ পারসী ভাষা শিক্ষা করিতেন। এবং সমাজে ও রাজকার্য্যে বহুসংখ্যক পারসী শব্দ ব্যবহৃত হইত। যথা—

বিক্রয় কবলাতে লেখা হইত—

"রাজি রাগবতে বহল তবিয়তে" ইত্যাদি, বর্ত্তমান সময়ে লেখা হয় "সজ্ঞানে ও সুস্থশরীরে" ইত্যাদি।

কজ্জখতে লিখা হইত "নগদ দস্ত বদস্ত" ও, "কিস্তিবকিস্তি" এই শব্দগুলি বর্ত্তমানেও ব্যবহৃত হয়। এবং "ওয়াশীল বাবতে অন্য সাবুদ দস্তাবেজ গুজরাইলে তাহা বাতিল বা নামঞ্জুর" বর্ত্তমানে লেখা হয়, "ওয়াশীল বাবত অন্য প্রমাণ দর্শাইলে তাহা অগ্রাহ্য"

তদ্ভিন্ন অফিসে কোন আমলাকে পরয়ানা দিতে হইলে লেখা হইত, "ইজ্জা তাহার শ্রী অমুক বাফিয়ত বাসন্দা" এক্ষণে আর উক্ত শব্দগুলি ব্যবহার হয় না। তৎব্যতীত আরও অনেক পারসী শব্দ অফিষে ব্যবহার হইত যথা—

সফিনা, ছানি, তজবিজ, গাওয়া, সওয়াল, জবাব, দলিল দস্তাবেজ, ইত্যাদি।

এবং তখন মোক্তার ও উকীলেরা হিন্দিতে বক্তৃতা করিতেন।

সমাজে কথাবার্ত্তা বলিতেও বহুতর পারশী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যথা—

জল্‌দি এস, বেয়াদব, বেকায়দা, চোপ্‌রাও, ইত্যাদি।

বর্ত্তমান সময়েও বহুতর পারসী শব্দ সমাজে ও অফিসে ব্যবহৃত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

রচনা প্রণালী।

তখন সমাজের রচনা প্রণালী ভিন্নরূপ ছিল। লেখকের বিষয় ও ব্যাকরণ এবং অভিধানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। কর্ত্তা কর্ম্ম, ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ, উপসর্গ, সমাস ও তদ্ধিত এবং শব্দের উৎকর্ষ ও প্রবন্ধের ভাব প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত হইত। তৎকালে দেশের খ্যাতনামা লেখকগণ উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেন। প্রাচীন রচনা প্রণালী কথঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

শূদ্রক নামে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন অতি বদান্য প্রবল পরাক্রান্ত এক নরপতি ছিলেন। বিদেশানাম্নী নগরী তাহার রাজধানী ছিল। যেখানে চিত্রবতী নদী ভ্রুকুটি ও ভ্রুভঙ্গি করতঃ ভাগীরথীকে উপহাস করিতেছে:—(কাদম্বরী)।

"ভূপতির এতাদৃশ বিনয় বাক্য শ্রবণে, মহর্ষি অবাত বিক্ষোভিত মীনাহতি রহিত গভীর জলাশয়ের ন্যায় ক্ষণকাল স্তিমিত ভাব অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার, রাজর্ষিকে বলিতে লাগিলেন।"

(রঘুবংশ)

"ভূপতি সেই মৃগশিশুর প্রতি শরক্ষেপ করিতে উদ্যত হওয়ায় দূর হইতে, দুই ঋষিকুমার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রম, মৃগ-বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। রাজন্!

আপনার শস্ত্র আর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, কিন্তু নিরপরাধীকে প্রহার করিবার জন্য নহে।" (অন্যস্থলে)

"অয়ি! আত্মগুণাবমানিনি! কোন্ ব্যক্তি আতপত্র দ্বারা শরৎকালীন জ্যোৎস্না নিবারণ করিয়া থাকে?" (শকুন্তলা)

"এখানে একদিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক সুললিত লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক খণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্য লাবণ্য পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকীরণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন। কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষাস্বরূপ ম্লান করিতেছিলেন।" (চারুপাঠ ৩য় ভাগ)

জাহ্নবী জলপূত যে পাটলিপুত্র ও শিপ্রাসলিল সুস্নিগ্ধ অবন্তি-কায়। অতি বিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আদিম সূত্র ঐ দিনই ভারত রাজ্যে পতিত হয়। আরোগ্য রূপ অমূল্য রত্নের আকর স্বরূপ যে আয়ুপ্রদ শুভকর শাস্ত্র, আবহমান কাল স্বদেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় অসংখ্য লোকের রোগ-জীর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডলকে স্বাস্থ্য গুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারত ক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। (অন্য স্থলে)

অন্যস্থলে—"ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন পদবীতে আম্রশাখা-সমন্বিত সলিল-পূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি। এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া আনি। ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃ-পুরুষদিগের পদাম্বুজ রজ গ্রহণ করিয়া কালেবর পবিত্র করি। (অক্ষয়কুমার দত্ত উপাসক সম্প্রদায়।)

চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া গভীর নীল আকাশ পটে যেন চিত্রের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল শ্বেত সৌধমালা চন্দ্র কিরণে রৌপ্য মণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত হইতেছে। (রমেশচন্দ্র দত্ত) "উপাসকে উপাসকে।"

এইস্থানে আসিলে সকলেই সমান। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত, মহৎ, ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইংরেজ, বাঙ্গালী এইখানে আসিলে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক সকল বৈষম্যই এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রুসাই বল, রামমোহন রায় বল, কিন্তু এমন সাম্য সংস্থাপক স্থান এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব একদর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটকলেখক, একই মূল্য বহন করে। তাইবলি এ স্থান ধর্ম্মভাব পূর্ণ, এস্থান সদুপদেশ পূর্ণ, এ স্থান পবিত্র। (শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়) "শ্মশানে।"

"যে অমানুষিক প্রতিভাবলে ভারতে মহাভারত স্থাপিত হই-য়াছিল, প্রভাস তীরে অকালে তাহার তিরোধান হইলে, সেই ধর্ম্ম রাজ্যের ভিত্তি এরূপ দৃঢ় ভাবে ধর্ম্মে স্থাপিত হইয়াছিল যে, তাহা কিছু কালের জন্য কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেও, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া স্থায়ী হইয়া, ভারতে সুখ ও শান্তির বিধান করিয়াছিল। কালে গীতার ধর্ম্ম লুপ্ত হইল। অনন্ত জ্ঞান-সম্পন্ন শাস্ত্রকারদের জ্ঞানান্ধ উত্তরাধিকারীগণ ভারতের শক্তি জাতিভেদ শৃঙ্খলে দৃঢ়ভাবে বাঁধিলেন। ধর্ম্ম কেবল যাগ যজ্ঞ এবং নরহত্যা ও জীব হত্যায় পরিণত হইল। (৺নবীনচন্দ্র সেন) 'পুরাতনদিল্লী।'

"ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী। তিনি অনেক পুরুষ-রত্নের জননী। স্বাধীন হিন্দু রাজত্বের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। যে সময়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ গম্ভীর বেদ-গানে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেন, যে সময়ে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ও ভবভূতি বিধাতা-প্রদত্ত অমৃত-পূর্ণ বীণাধ্বনিতে ইন্দ্রজালের ন্যায় ভুবন বিমোহিত করিতেন, যে সময় কপিল, গৌতম দর্শন শাস্ত্রের, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব সকল ভেদ করিয়া মানব বুদ্ধির আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে সময়ে আর্য্যভট্ট, বরাহ মিহির প্রাকৃতিক তত্ত্বের জ্ঞানপিপাসু হইয়া গগনমণ্ডল পর্য্যটন করিতেন।" ইত্যাদি (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) "রাজা রামমোহন রায়।"

"পরে সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী যুবতীর লোভনীয় যৌবন-মাধুরী সন্দর্শন করিয়া স্বয়ম্বরস্থ সমস্ত ভূপতিগণ-বিস্ময় বিস্ফারিত, নিমেষ-শূন্য, একতান নয়নে স্তম্ভিত, চিত্রার্পিত বা

উৎকীর্ণের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাদের শরীর মাত্র সিংহাসনে রহিল, মনোনেত্রাদি, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ইন্দুমতীর লাবণ্যসাগরে মগ্ন হইল। (৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার) "ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর।"

"এই সমস্ত সুখের নিদানভূত যে নরপতি, তিনি নিঃসন্দেহ প্রজাদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ও প্রণয় ভাজন হইয়া, হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন। অতএব, টেলিমেকস্! যদি দেবতারা তোমাকে তোমার পৈত্রিক সিংহাসনে অধিরূঢ় করেন, রাজধর্ম্মানুসারী হইয়া তোমার এইরূপে প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধনে তৎপর হওয়া উচিত।" (টেলিমেকশ্)

উল্লিখিত রচনা-প্রণালী অবলম্বন করতঃ তৎসময়ে বঙ্গীয় লেখকগণ নানাবিধ প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রণয়ন করতঃ এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাকান্ত তর্করত্ন, অক্ষয়কুমার দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত, রাজনারায়ণ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা গ্রন্থকারগণ প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থাদি রচনা করিতেন।

কিন্তু ক্রমশঃ পূর্ব্ব রচনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন স্বভাব বর্ণন সময়েও লেখকগণ পূর্ব্ব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল। যথাঃ—

বসন্ত সমাগমে কুসুম উদ্যানে সুরভি প্রসূন রাজি প্রস্ফুটিত হইয়া, উদ্যানের কমনীয় শোভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল। বসন্তানীল মৃদুমন্দ প্রবাহিত হওয়াতে, মানবগণের সন্তাপিত

হৃদয় সুশান্ত হইল। অলিকুল মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া গুণ গুণ স্বরে পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করতঃ মধুপানে আসক্ত হইল। কুসুম-সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতে লাগিল। কোকিলার কুহুরবে, ভ্রমরের সুমধুর ঝঙ্কারে, বিরহিনীকুলের কোমল হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। ইত্যাদি।

বহুকাল পর্য্যন্ত সমাজের লেখকগণ এইরূপ অতীত সময়ের রচনা-প্রণালী অনুসারে, প্রবন্ধাদি ও স্বভাব বর্ণন এবং নানা-বিধ পুস্তকাদি রচনা করিতেন। তৎপর বঙ্গীয় সাহিত্য-সমা-জের সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাত্মার প্রণীত উপন্যাস দেশে প্রকাশিত হইলে, দেশের রচনা-প্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সমাজের লেখকগণ বঙ্কিমবাবুর লেখার পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইলেন। এবং নিম্নলিখিত প্রণালীতে স্বভাব বর্ণন আরম্ভ করিলেন। যথাঃ—

বসন্তকাল, কাননে নানাবিধ ফুল ফুটিয়াছে। অলিকুল ফুলে ফুলে বসিতেছে, উড়িতেছে, মধুপান করিতেছে। একবার বসিতেছে, আবার উড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া পুনরায় গুণ গুণ স্বরে চতুর্দ্দিক ছুটিতেছে। ইত্যাদি।

অন্যান্য প্রবন্ধাদিও উল্লিখিত প্রণালীতে বিরচিত হইতে থাকিল। দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই এক বাক্যে স্বীকার করেন এবং আমরাও এ কথা স্বীকার করিতেছি যে, সুপ্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের অসাধারণ উৎকর্ষ বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, বোধ হয়, একথাও কেহ

অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বঙ্কিমবাবুর প্রণীত উপন্যাস সমাজে প্রকাশিত হইলে, দেশের পূর্ব্ব রচনা-প্রণালীর অনেকাংশে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

অতঃপর সমাজের অধিকাংশ লেখকগণই বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের ভাষায়, প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেক লেখকেরই হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, যে তাঁহাদের রচনায় যেন রস টস টস করিয়া পড়িতেছে। পরিমল টল টল করিয়া লড়িতেছে, তাই কোন কোন লেখকের লেখনী, সেই টলটলা মধু নিস্রব করিতে গিয়া, কঠিন নির্য্যাস বৎ চিটাগুড় প্রসব করিতে থাকিল। রচনাপ্রণালী এইরূপ ভাবে কিছু দিন চলিতে লাগিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আবার তাহা ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে আর কোন লেখকই কোনরূপ রচনা-প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ প্রণালীতেই পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রণয়ন করিতেছেন। পূর্ব্ব রচনা-প্রণালী যে উৎকৃষ্ট ছিল, তাহা পাঠকগণ এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান রচনা-প্রণালী যে অপকৃষ্ট একথাও আমরা বলিতে সাহস করি না। সুতরাং তৎবিষয়ের বিবেচনা ভার পাঠকগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিল।

নবম অধ্যায়।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।

কবি ও কাব্য।

অতি প্রাচীন সময় হইতেই ভারতভূমে বহুল কবিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া কল্পনাবলে চির অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। যদিচ তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ আমাদের বর্ণিত সময়ে নহে; কিন্তু তাঁহাদের সেই উচ্চ কল্পনা-প্রসূত সুমধুর গ্রন্থাবলী সেই সময়ে সমাজের ব্যক্তিগণ অতীব যত্ন ও উৎসাহ এবং অনির্ব্বনীয় ভক্তি সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। এবং সেই সুধাময় গ্রন্থাবলী সমাজে বিশেষ প্রচলন ছিল। সুতরাং সেই প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় কবিগণের নাম ও তাঁহাদের প্রণীত সুমধুর গ্রন্থসমূহের সুধাময় কবিতা সকলের কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

প্রাতঃস্মরণীয় কবিপ্রবর জয়দেব গোস্বামী কৃত "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থখানি তখন সমাজের ব্যক্তিগণ অতীব ভক্তি সহকারে পাঠ করিতেন। উক্ত গ্রন্থখানি আদ্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। এবং "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থে রাধা কৃষ্ণের বিচিত্র বৃন্দাবন বিহার বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ রাসলীলা, শ্রীরাধার মান, মান ভঞ্জন, রাধা কৃষ্ণের নিকুঞ্জ কাননে বিরলে রসালাপ; সখীগণের সঙ্গে রাধা কৃষ্ণের হাস্য পরিহাস ও কথোপকথন ইত্যাদি। গ্রন্থের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় অংশেই

রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র বিলাস ও আদিরস পূর্ণ। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে তাহা আদিরস বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ভগবানের সেই অপূর্ব্ব লীলা কাহিনী, ভগবদ্ভক্তজনের হৃদয়ে, স্বর্গীয় পবিত্র ভক্তি-বারিবর্ষণ করিতে থাকে। তজ্জন্যই সে সময়ে সমাজের পবিত্র হৃদয় ব্যক্তিগণ অতি শ্রদ্ধার সহিত "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতেন। বিশেষতঃ গোস্বামী মহাশয়েরাও সমাজের কৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অতি আগ্রহ ও যত্ন এবং ভক্তি সহকারে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

গ্রন্থের সূচনায় ভগবদ্ভক্ত স্বর্গীয় কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব লিখিয়াছেন যথা :—

> "মেঘৈর্ম্মেদুরমম্বরং বন ভুবঃ শ্যামাস্তমাল দ্রুমৈ
> র্নক্তং ভীরু রয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে প্রাপয়॥।
> ইত্থং নন্দনিদেশ তশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্ব কুঞ্জদ্রুমং।
> রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা কূলে রহঃ—কেলয়ঃ ॥ ১।

হে রাধিকে! নভমণ্ডল নিবিড় জলদজালে সমাবৃত হইয়া উঠিল, বন-ভূভাগও শ্যামল তমালতরু নিকরে অন্ধকারময়, শ্রীকৃষ্ণ অতীব ভয়শীল, নিশাভাগে একাকী গমনে সমর্থ হইবেন না; সুতরাং তুমি ইঁহাকে আপনার সঙ্গে লইয়া গমন কর।" নন্দ কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞপ্ত হইয়া বৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধা সতী, হরি সমভিব্যাহারে যমুনাকূলে কুঞ্জকাননে উপস্থিত হইয়া বিরলে কেলি রসে প্রবৃত্তা হইলেন।

তাহাদিগের সেই গুপ্ত কেলি ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ মহাব্যক্তি-গণের হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হইয়া জয়লাভ করুক।

বাগ্দেবতা চরিত বিচিত্র চিত্র পদ্মা
পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী
শ্রীবাসুদেব রতিকেলি কথা সমেত
মেতং করোতি জয় দেবকবিঃ প্রবন্ধম্।

যাঁহার চিত্ত মন্দির হরি চরিত চিত্রে সমাঙ্কিত, যিনি শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম সেবায় নিরত, সেই মহাকবি নর্ত্তকপ্রবর জয়দেব শ্রীহরির রতি কেলি কথা সম্বন্ধীয় এই গীত গোবিন্দ নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমম্।
তরুনি মধুরালাপৈ স্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ।
সুমুখি বিমুখী ভাবং ভাবদ্বিমুঞ্চ নমুঞ্চমাম্।
স্বয়মতিশয় স্নিগ্ধো মুগ্ধে প্রিয়োঽয় মুপস্থিতং। ১৩।

হে কৃশোদরি! তুমি অকারণে বিষণ্ণ ভাবে থাকাতে, আমি ব্যথিত হইতেছি। সে বেদনা দূর করিয়া প্রিয় সম্ভাষণ কর। হে রাধে! মম সন্তাপ নিবারণ কর। প্রিয়তমে! দয়া করিয়া মৌনভাব ত্যাগ কর। হে মুগ্ধে, আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। আমাকে ত্যাগ করিও না ইত্যাদি।

কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি প্রণীত "রাধাকৃষ্ণ বিলাস।"

কবিকল্পনায় উচ্চ আদর্শ। কিন্তু বিদ্যাপতির রচনা সমুদায় হিন্দি বিমিশ্রিত ([illegible]বুলিতে) পরিপূর্ণ তজ্জন্ত সাধারণের বুঝিবার

গরল খাইল, তবু না মরিল
ভাঙ্গড়ের নাহি যম।"

অন্য স্থলে দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বর পাটুনিকে পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এস্থলেও কবি-কল্পনার উচ্চ আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে।

যথাঃ—

"ঈশ্বরে" পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
শুনহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখো বংশ জাত।
অতীব কুলীন স্বামী বন্দ্যো বংশ খ্যাত॥
কুকথায় পঞ্চ মুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সহ দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।
অভিমানে সাগরেতে ঝাঁপ দিল ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তার কাছে যাই।" ইত্যাদি।

কবিশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিনি শিশুশিক্ষা প্রথমভাগে যে একটি সরল ও সুমধুর কবিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাদৃশ মধুময়ী কবিতা এপর্য্যন্ত কোন কবির লেখনী হইতে প্রকাশিত হয় নাই। যে কোন কবি, কবিতা সংগ্রহ করুন না কেন, সর্ব্বাগ্রেই "পাখী সব করে" রব রাতি পোহাইল" এই মধুর কবিতাটী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও

কতিপয় পুস্তক প্রণয়ন করতঃ স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত। তিনি প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এবং উক্ত পত্রিকায় তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুক্ত বহুল বহুল সুমধুর কবিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সে সকল কবিতা পাঠ করিয়া সমাজের বহুল ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবি ঐ সকল কবিতা একত্র করিয়া কোন পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নাই। এবং সমাজের কোন ব্যক্তিও ঐসকল কবিতা-কুসুমাবলী একত্রিত করিয়া পুষ্পহার গ্রন্থন করতঃ কবির কোন স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত করিয়া যান নাই। নিম্নে তাঁহার সুমধুর কবিতাবলীর কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

যথাঃ—

"সংসার সাজঘর"

"বাজিকর হয়ে কত করিতেছ বাজি।
যখন যে সাজ দেও সেই সাজে সাজি।
সাজঘরে বসে তুমি সাজাইছ কত।
আপনি সাজিয়া সাজ জ্ঞান হই হত।
সাজ পেয়ে নেচে উঠি আপনার জাঁকে।
কি ছিলাম কি হলেম বোধ নাহি থাকে।"

"সংসার কানন"

"দেখরে অবোধ জীব কাল বয়ে যায়।
সংসার অরণ্যে আসি কি করিলে হায়।

কি দেখিলে কি শুনিলে কি করিলে সার।
কি ফল পাইলে বল ভ্রমিয়া সংসার।"

"ভক্তাধীন ভগবান্"

"যে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও,
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তছাড়া নও;
ভাবময়! ভাবরূপে অন্তরেই রও।
অন্তর অন্তর তুমি কদাচ না হও।"

"বিভু পূজা"

"জয় জয় জগদীশ জগতের সার।
সকলি অসার আর সকলি অসার।
ইচ্ছায় করিছ সৃষ্টি বিবিধ প্রকার।
ইচ্ছায় করিছ পুনঃ সকলি সংহার।
ইচ্ছাময়! ইচ্ছা তব কে বলিতে পারে।
বর্ণহারে বর্ণিবারে সদা বর্ণ হারে।"

"কাল"

"অপরূপ একপক্ষী জীবের না হয় পক্ষী,
দুইপক্ষ দুইপক্ষ যার।
জন্মলাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতিপদে
লোকে বলে পদ নাই তার।"

"তপস্বী সাধু"

"কষিত কণক কান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাঁড়ি তপস্বীর প্রায়।"

পাখী নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস সর্ব্ব অঙ্গে মাখা।
ডিস্‌ভরে ফিস্ লয় মীস বাবা যত।
পিস্ করে মুখে দিয়ে ফিস খায় কত।
যত পাই তত খাই করি বাজী ভোর।
হায় রে তপস্বী তোর তপস্যা কি জোর।"

"আনারস"

"বন হ'তে এলো টিয়ে রূপ মনোহর।
সোণার টোপর তার মাথার উপর।
কেবা বলে আনারস, আনারস হয়।
আমি দেখি ষোল আনা আনারসময়।"

কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গের সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্তকে উপহাস করিয়াছেন। যথা :—

"কে বলে অক্ষয় মত কে বলে অক্ষয়।
সে যে মত মত নহে মন্দ অতিশয়।
প্রণিধান কর সবে গুণের বিচারে।
সে মত অক্ষয় হ'লে ক্ষয় বলি কারে।
আমিষ অবিধি বলে যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল।
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে;
ঘুরিতেছে মাথা মুণ্ড মাথা মুণ্ড লিখে।
ছেড়ে দাও ছেলে খেলা ফেলে দাও কুম।

মাস মাছ ভাত খেলে ক'ষে দাও ঘুম।
করোনাকো ধুমধাম টুম টাম আর।
ছিঁড়ে ফেল বাহ্য বস্তু সে মত অসার।"

কবি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উপহাস করিয়াছিলেন।

যথা :—

"সাগর গভীর বটে বিহীন রতন।
এমন সাগরে আমি করিনা যতন।"

কবিবর খ্রীষ্টান মিসনরীদিগকে উপহাস করিতেন।

"যিশু যদি হইলেন মেরীর তনয়।
ঘোষের তনয় তবে দোষের ত নয়।
মেরীর তনয় যদি তরাতে পারে জীব।
কি দোস করিল মোর ভোলানাথ শিব।"

কবিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। তাঁহার প্রণীত সদ্ভাব-শতক, বঙ্গবাসীর প্রধান গৌরবের সামগ্রী। তাঁহার পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। একারণ তিনি পারস্য ভাষায় অতি উচ্চ কেতাব "হাফেজ" অনুবাদ করতঃ সদ্ভাব-শতকের অনেক স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উক্ত পুস্তকে যে সমুদায় সারগর্ভ ও উপদেশ-পূর্ণ সুমধুর কবিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা বঙ্গ ভাষার প্রায় অধিকাংশ পুস্তকেই দৃষ্ট হয় না। সদ্ভাব-শতকের প্রত্যেক কবিতা পাঠ করিলে হৃদয় অতুলনীয় প্রেম ও ভক্তি রসে পরিপ্লুত হইতে থাকে।

যথা :—

"নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে।
নম চিন্ময় সত্য সনাতন হে।
তুমি সর্ব্ব শরণ্য বরণ্য গতি।
ভব-ভাবন নাশ নিদান তুমি।
তুমি তাপ-নিবারণ পাপহারী!
তুমি ভীম ভবার্ণবে ভেলক হে।"

অন্যস্থলে

"সত্য সত্য সত্য বটে ওহে নৃপবর।
তোমায় আমায় আছে অনেক অন্তর॥
স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কেতে তোমার শয়ন।
আমি করি বৃক্ষমূলে যামিনী যাপন।
তোমার অরুচি হয় দধি দুগ্ধ সরে।
দ্বারে দ্বারে ফিরি আমি মুষ্টি ভিক্ষা করে।
পরিধান কর তুমি বিচিত্র বসন।
আমি করি তরু-ত্বকে তনু আচ্ছাদন।
কিন্তু যবে দুটি নয়ন মুদিব মুদিবে।
সে সময়ে এ ভিন্ন কিছু না রহিবে।
এক ঠাঁই করে যদি উভয়ের দেহ।
কে ছিল দরিদ্র ভূপ চিনিবে না কেহ।"

কবি-শিরোমণি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার প্রণীত পদ্মিনী উপাখ্যান পাঠ করিলে হৃদয়ে অনন্ত অনন্দ-উৎস প্রবল

বেগে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। কবি পদ্মিনীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন যথা ঃ—

"পতিব্রতা পতি-রতা, অতি বড় সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃদি-পদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, যথা লজ্জাবতী লতা
মৃতপ্রায় পর-পরশনে।
থাকুক সে পরশন, পরমুখ দরশন
সহনীয় না হয় সতীর।
দৃষ্টি মাত্র সেই ক্ষণে, সরমের হুতাশনে
দগ্ধ হয় কোমল শরীর।
পদ্মিনীর পদ্ম-নেত্র, বিনোদ বিহার-ক্ষেত্র
ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পলকেতে প্রতি পলে, বঙ্কিম কটাক্ষ ছলে
চারিদিকে অমৃত সঞ্চারে।"

পদ্মিনী উপাখ্যানের আদি-অন্ত অতীব—চিত্ত বিমুগ্ধকর রচনায় পরিপূর্ণ; নানা কারণে অধিক উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

এতদ্ভিন্ন তৎকালে বহুল কবির লেখনী-প্রসূত বিবিধ গ্রন্থ-সমাজে প্রকাশিত ছিল, হরিশ্চন্দ্রের নির্ব্বাসিতা সীতা, মদন-মোহন মিত্রের কবিতা-কদম্ব, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যপাঠ প্রভৃতির রচনা পাঠ করিয়া পাঠকগণ অতুল আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

তখন সমাজের লোক আদিরস-পূর্ণ পুস্তকগুলি সযত্নে পাঠ করিতেন। তজ্জন্য কুরুচি-সম্পন্ন গ্রন্থকারগণ "যেন তেন প্রকারেন" এক একটী নায়ক নায়িকা সংগঠন করতঃ কোন একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া এক এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিতেন। পুস্তকের ভাব কিম্বা ভাষার তত্দূর তাৎপর্য্য থাকুক বা না থাকুক, কেবল পয়ার ও ত্রিপদি ছন্দে শব্দে শব্দে পরিণয় ঘটাইয়া, আগা গোড়া আদি রসের আঁগুশ্রাদ্ধ করিতেন। এবং সমাজের লোকেও, তৎকালের রুচি অনুসারে ঐ সকল পুস্তকগুলি সযত্নে পাঠ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সে সকল পুস্তকগুলি সমাজ হইতে এককালীন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যথা, কামিনীকুমার, সুধাংশু কামিনী, নারীর ষোলকলা ইত্যাদি।

ইহার কিঞ্চিৎ কাল অতিবাহিত হইলে, বঙ্গ-মাতার সুকুমার কবিকুলপঙ্কজ স্বর্গীয় মধুসূদন দত্ত অতি শুভক্ষণে ও শুভলগ্নে লেখনী ধারণ করিলেন। মধুর সুমধুর বীণা ঝঙ্কারিত হইয়া ললিত তানে বঙ্গভূমি আন্দোলিত করিল। কবিকুল-চূড়ামণি মধুসূদন সাহিত্য-কানন প্রভৃতি যে সুরভী-কুসমজাত পরিমল সংগ্রহ করিয়া, বঙ্গভূমে অপূর্ব্ব মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গবাসীগণ সেই অক্ষয় মধুচক্র-বিনিঃসৃত মধুরাশি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পান করিলেও তাহা নিঃশেষ হইবে না। মধুসূদন ইংলণ্ড গমন কালে বঙ্গ-মাতাকে সম্বোধন করিয়া যে প্রেমপূর্ণ সুধাময় কবিতাটি প্রণয়ন করেন; তাহার বর্ণে বর্ণে বিমল সুধা রাশি নিঃসৃত হইতেছে।

পক্ষে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয়। নিম্নে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

কি কহব রে সখি! কানুক রূপ।
কো পতিয়ার স্বপন স্বরূপ!
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ।
* * * * *
ঋতুপতি রাতি রসিক বর সাজে।
রসময় বাস রসভ রাস মাঝে।
রসবতী রমণী রতন ধনী রাই।
রাস রসিক সহ রস অবগাই।
* * * * *
এধনি! মানিনি! কঠিন পরাণী।
ঐছন বিপদে তুহুনা কহিস বাণী।
ঐছন নহে ধনি! প্রেমক রীত।
অবাক মিলন হোয়ে সমুচিত। ইত্যাদি।

কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেনের প্রণীত গ্রন্থ সকলও তখন সমাজে প্রচলন ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির রচনাও নিতান্ত মন্দ ছিলনা। অনেক গ্রন্থকার কবিতা সংগ্রহ করিতে কবিরঞ্জনের কবিতা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের 'উমার আব্দার বহুল সংগৃহীত পুস্তকে দৃষ্ট হয়; * যথাঃ—

উমার আব্দার।

গিরিবর আর আমি পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেন্দে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
উঠি বসি গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোল পরে।
সানন্দে কহিছে হাঁসি, ধরমা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ।
বিনিন্দিত কোটী শশধরে।
শ্রীরাম প্রসাদ কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়
জগৎ জননী যাঁর ঘরে।

সীতার বিলাপ।

মোরে বিধি বাম, গুণসিন্ধু রাম
কি দোষে গেলেন ছাড়িয়া হে।
জনক দুহিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে
লব কুশ দোহে লইয়া সঙ্গেতে,

আইলা জীবন নাথেরে দেখিতে
শিরে করাঘাত পড়িয়ে মহীতে
হাহাকার রবে কান্দিয়া হে।

কবিরঞ্জন কৃত একখানি বিদ্যাসুন্দর পুস্তকও তখন সমাজে প্রচলিত ছিল, তৎপর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর প্রকাশিত হইলে, সে বিদ্যাসুন্দর খানি এককালীন বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহার রচনাও অতীব প্রশংসনীয়। যথা—

"শুনি রাণী হেন বাণী ধায় ক্রোধ ভরে।
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে।

দুঃখের বিষয়, সে পুস্তক খানির অস্তিত্ব বিলীন হওয়াতে তাহার অধিকাংশ স্থান উদ্ধৃত করা গেল না। সমাজের কোন কোন ব্যক্তি বলেন, কবিরঞ্জন কৃত বিদ্যাসুন্দরের রচনাই শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে কোন কোন ব্যক্তি বলেন, ভারতচন্দ্রের প্রণীত বিদ্যাসুন্দরের রচনাই প্রশংসনীয়। যাহা হউক, আমরা "আদার ব্যাপারী", আমাদের জাহাজের খবরে দরকার কি? তবে মোটের উপরে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভারতচন্দ্রের প্রণীত বিদ্যাসুন্দরের রচনায় যাদৃশ মাধুর্য্য রহিয়াছে, কবিরঞ্জন-কৃত বিদ্যাসুন্দরে তাদৃশ মধুরতা আছে কিনা সন্দেহ।

তখন কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশিদাসের মহাভারত সমজে বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল। অধিকাংশ ব্যক্তি অপরাহ্নে ও রজনীতে বিশেষ ভক্তি সহকারে, রামায়ণ ও মহাভারতে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলাকাহিনী পাঠ করিয়া হৃদয়ে অতি

পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতেন। এমন কি, অনেক দোকান-দারেরাও আহারান্তে দোকানে বসিয়া, সুমধুর স্বরে ও উচ্চ রবে এবং প্রফুল্ল চিত্তে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান" ইত্যাদি যে পাঠ করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্রোত প্রাবাহিত হইতে থাকিত, বলিতে কি, সত্য সত্যই মহাভারতের কথা অমৃত তুল্য। সেই পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময়, সেই বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেছি, শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু যখনই পাঠ বা শ্রবণ করি, তখনই নূতন; তখনই যেন স্বর্গীয় অমৃতধারা শ্রবণ-যুগলে বর্ষণ হইতে থাকে।

রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা অতি সরল ও অতীব মধুর। কিন্তু মহাভারতের স্থানে স্থানে কবির অপূর্ব্ব রচনা-চাতুর্য্যের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

"দেখ দ্বিজ মন সিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা
মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।
সিংহ গ্রীব বন্ধু জীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসার
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করীবর। ইত্যাদি।

রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাবলী বঙ্গবাসীর একরূপ কণ্ঠস্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের অন্য অংশ উদ্ধৃত করা গেল না।

ইহার পরেই কবিকুল চূড়ামণি মহামতি ভারতচন্দ্র রায়, সুমধুর গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করতঃ কবির শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। তাঁহার এতাদৃশ অলোক-সামান্য কবিত্ব-শক্তি অবলোকন করিয়া কৃষ্ণনগরের পরম বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"আদেশিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভারতচন্দ্রের প্রণীত গ্রন্থগুলি ভারত-ভাণ্ডারের সুদুর্লভ রত্ন-সদৃশ, কিম্বা ভারতাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। এবং একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতচন্দ্র রায়ই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় নানাবিধ ছন্দ প্রকাশ; করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বঙ্গীয় কবিগণ তাঁহার নিকট প্রকৃত ঋণী। এবং তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকটে অজস্র ধন্যবাদের পাত্র।

তাঁহার প্রণীত "বিদ্যাসুন্দর" "অন্নদামঙ্গল" "চোরপঞ্চাশত" প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি স্বীয় অনির্ব্বচনীয় কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় সুমধুর গ্রন্থ এপর্য্যন্ত বঙ্গভূমে প্রকাশ হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি বিদ্যাসুন্দরের স্থানে স্থানে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, কিছু

কিছু আদিরস প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে বিদ্যাসুন্দর, নিশ্চয় বিদ্যালয়ের একখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক স্বরূপে পরিগণিত হইত। কবি বিদ্যাসুন্দরের আদি-অন্ত যাদৃশ রচনা-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে শতমুখে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? গ্রন্থের কতিপয় স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

কবি গ্রন্থের সূচনায় সুন্দরের উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

"যদি কালী কুল দেন কূলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কয়ে গেল ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।
আহা বিদ্যা কোথা বিদ্যা বিদ্যা কোথা পাব।
কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব॥

কবি বিদ্যার রূপ বর্ণন করিয়াছেন।

"বিনোনিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কেবলে শরদ শশী সে মুখের তুলা।
পদ পথে পড়ে তার আছে কত গুলা॥
কেড়ে নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কান্দেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব হেরিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥

করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু।
সুবলিনী শিখিবারে মানিলেন গুরু॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥

মালিনী সুন্দরকে হাট বেশাতির সংবাদ বলিতেছে।

"হীরা বলে লেখা করি বুঝহ বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করয়ে বাছনি॥
যদি বল বোনপোরে মাসী দেয় খোঁটা।
যদি টাকা দিয়ে ছিলে সব কটি খোটা!
আদ পোণে আদসের আনিয়াছি চিনি।
তন্থ লোকে ভুরাদেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
আট পোণে আনিলাম কাঠ আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি।
খুন হয়ে ছিনু বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে।
শেষেনা যুয়ায়ে কড়ি আনিলাম চেয়ে।
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায় ফল!
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥

কোটাল কর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত সুন্দর রাজাকে বলিতেছেন।

"শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর।
পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়।
বিচারেতে যেই জেনে সেই লয়ে যায়।

দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ, দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ॥

কবি স্থানে স্থানে স্বীয় নাম উল্লেখ করিয়া যে সমুদায় উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, অদ্যাপি সমাজের লোকে কথা প্রসঙ্গে উক্ত বাক্য গুলি সর্ব্বদাই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

"রায় বলে কেন রাজা ভাবিছ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥

অন্য স্থলে—

রায় বলে কিবা বাছা দেখিছ এখন।
বুঝিব তখন দায় ঠেকিবে যখন।

কবিপ্রবর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে যেরূপ রচনা নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাবধি কোন কবি সেরূপ রচনা-চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দক্ষ ক্রোধান্ধ হইয়া সভাস্থলে দেব মহাদেবের অজস্র নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু কবিবর সেই নিন্দা বাক্য স্থলে অন্যার্থে মহাদেবের স্তব করত অসাধারণ রচনা-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যথা তথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়!
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান
শ্মশানে ভবনে সম।

যথা :—

রেখ মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মন-কোকনদে।
বিবর দৈবের বশে জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চির স্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে।
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে নাহি পড়িলে অমৃত হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে, নরে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্ব জন।
কিন্তু কিবা গুণ আছে, যাচিব মা তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে।
ফুটি যেন স্মৃতি জলে মানসে মা যথা ফলে,
মধুময় তামরসে কি বসন্ত কি শরদে।

মধুসূদন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করতঃ বঙ্গভাষায় "অমিত্রাক্ষর" ছন্দ অবিষ্কার করিয়াঃ উক্ত ছন্দে সর্ব্ব প্রথমে মেঘনাদবধ কাব্য" প্রকাশ করিলেন। সহসা এই অভিনব ছন্দে বিরচিত মেঘনাদ বধ কাব্য বঙ্গভূমে প্রকাশিত হইলে, সমাজের লোকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ উল্লেখ করিয়া বিবিধ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। এবং নানা রূপ উপহাস ও ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করিতে

থাকিলেন। কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদক অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি নিম্নলিখিত শ্লেষ বাক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথাঃ—

কিনেছি কাপড় খানা ছআনা দামের।
ছিঁড়িয়া ফেলিলি বাছা আছাড় খাইয়া।
টেবিলিল সূত্রধর উত্তম টেবিল,
মনসাধে সিন্ধুকিল কাঠালের কাঠে।
সাগরিল হনুমান একই লাফেতে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ক্রমশঃ বঙ্গভূমে প্রচলন হইতে থাকিল। কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে—ক্রমে ক্রমে বীরাঙ্গনা, তিলোত্তমা ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি বহুল পুস্তক প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চিন্তাশীল কবির অনির্ব্বচনীয় চিন্তা প্রসূত, নবরসাত্মক "মেঘনাদ-বধ-কাব্য", মর্ত্ত্যভূমে স্বর্গীয় নন্দন-কাননের প্রফুল্ল পারিজাত কুসুম সদৃশ। মেঘনাদ-বধ-কাব্য পাঠ করিলে হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দ-স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। গ্রন্থের প্রত্যেক পংক্তিতে অজস্র সুধা ধারা বর্ষিত হইতে থাকে।

কবিবর মেঘনাদবধ-কাব্যে স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের কোন স্থানে বিশাল সমুদ্র কল্লোল সদৃশ গগনভেদী রণবাদ্য, সৈন্যগণের বীর হুহুঙ্কার, ভীষণ কার্ম্মুক টঙ্কার ইত্যাদি শব্দে পাঠকের হৃদয়ে অসামান্য ভীতির সঞ্চার হইতে থাকে। কোন স্থানে বীরোচিত জ্বলন্ত উৎসাহ-পূর্ণ বাক্যনিচয় শ্রবণে পাঠকের দেহের প্রত্যেক ধমনী ও শাখা ধমনী স্থিত রক্ত স্রোত বর্ষা কালীন প্রশান্ত স্রোতস্বতীর প্রবল তরঙ্গ

সদৃশ ধাবিত হয়। কোন স্থান পাঠ করিলে করুণ রসে পাঠকের সুকোমল হৃদয় দ্রবীভূত হওয়াতে অবিরল অশ্রুবারি বিনির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করে। গ্রন্থের কোন কোন স্থলে আদিরসের অনুপম জ্যোতিঃ মেঘাবৃত দিবাকরের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

মেঘনাদ-বধ-কাব্যের অপরিসীম মাধুর্য্য প্রভাবে অচিরকাল মধ্যেই উক্ত গ্রন্থ সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তাকর্ষণ করিল। প্রত্যেক বঙ্গবাসী অতি সমাদরে মেঘনাদ-বধ-কাব্য পাঠ করিতে লাগিলেন। এবং প্রত্যেক ব্যক্তি শত মুখে কবির অলোকসামান্য কল্পনা ও কবিত্ব-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকিলেন। সমুদায় বঙ্গবাসী অমিত্রাক্ষর ছন্দের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ব্যঙ্গোক্তি সকল অল্পকাল মধ্যেই তিরোহিত হইয়াগেল।

মেঘনাদ-বধ-কাব্যের স্থানে স্থানে যদিচ কবি বহুল স্বীয় মন গড়া শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যথাঃ—

ভাতিল, নাদিল, নিক্ষোষিলা, বারুণী ইত্যাদি, কিন্তু সময়ে সে শব্দ গুলি সোণায় সোহাগা হইয়া দাঁড়াইল। বহুল কবি উক্ত শব্দ গুলি সযত্নে ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

কবিবর মেঘনাদ-বধ কাব্যে যাদৃশ অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েকটী স্থান উল্লেখ করা গেল।

বীরনারী প্রমিলা বাসন্তীকে বলিতেছেন। যথাঃ—

"তূণে ভরা তীক্ষ্ণ শর কিন্তু খরতর—
আয়োত লোচন শর; দানব নন্দিনী
সখি! আমরা দানবী রাবণ শ্বশুর
মম, মেঘনাদ স্বামী; আমি কি ডরাই
সখি! ভিখারী রাঘবে?"

অন্যস্থলে প্রমিলা হনুমানকে বলিতেছেন—

"ভেবে দেখ মনে, যে বিদ্যুৎ ছটা রমে
আঁখি, মরে লোক তাহার পরশে।"

ইন্দ্রজিত সন্তাপিত চিত্তে বিভীষণকে বলিতেছেন—

"কি কহিলে তাত! রাঘবের দাস তুমি?
ফুটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি, গুরু জন তুমি; গতি
যার নীচ সহ নীচ সে দুর্ম্মতি।"

বীরবাহুর পতন সংবাদে রাবণ দূতকে বলিতেছেন—

"নিশার স্বপন সম তোর এবারতা
রে দূত! অমর বৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারি
বধিলা সম্মুখ রণে? ফুল দল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলি তরু রবে?"

কবিকুল-চূড়ামণি মধুসূদন দত্ত বৃদ্ধ কবিগুরু বাল্মীকির প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করতঃ বলিয়াছেন—

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে,
হে বাল্মীকি! হে ভারত শির-চূড়ামণি
তব অনুগামী দাস; রাজেন্দ্র সঙ্গমে,
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।
তবপদ চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে—কত যাত্রী যশের মন্দিরে
দমনিয়া ভব দম দুরন্ত শমনে।"

কবি বেদমাতা সরস্বতীর প্রতি ভক্তিপূর্ণ বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"বন্দিও চরণার বিন্দ মন্দমতি আমি
ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভূজে ভারতি!
যে মতি মাতঃ! বসিলা আসিয়া বাল্মীকি
রসনে, যবে খরতর শরে গহন
কাননে ক্রৌঞ্চ বধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ
বিন্দিলে; তেমতি দাসেরে আসি দয়া
কর সতী, কে জানে মহিমা তব এভব
মণ্ডলে;"

মেঘনাদবধ কাব্যের এক স্থানে কবি যে একটী সগর্ব্ব কাব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ভগবানের কৃপায় সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে যথা—

"তুমিও আইস দেবী মধুকরি-কল্পনে!
কবির চিত্ত ফুলবন মধু লয়ে'

রচ মধুচক্র ; গৌড় জন যাহে, আনন্দে
করিবে পান সুধা নিরবধি।"

সত্য সত্যই কবি তাঁহার মধুকরি কল্পনা-প্রসূত মেঘনাদবধ কাব্য সদৃশ যে অনুপম মধুচক্র বঙ্গভূমে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, গৌড়বাসী অদ্যাপি সেই মেঘনাদবধ কাব্য বিনিসৃতঃ বিমল মধুরাশি প্রফুল্লচিত্তে নিরন্তর পান করিতেছেন এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত পান করিবেন।

কবিবর মেঘনাদবধ কাব্যে নরকের যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতীব উচ্চদরের উপদেশ। এবং সর্ব্বজন প্রশংসনীয়। তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মেঘনাদবধ-কাব্যে, প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, বীরবাহুর পতনে রাবণের বিলাপ, বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের তীব্র ভর্ৎসনা, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে শ্রীরামের আক্ষেপ, শ্রীরামের নরক দর্শন, ও লঙ্কার বর্ণনা প্রভৃতি সুধাময় কবিতাগুলি কবি-কল্পনার উচ্চ আদর্শ। এতৎ ভিন্ন তিনি ক্রমশঃ কৃষ্ণকুমারী নাটক, চতুর্দ্দশপদি কবিতাবলী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়শালিকের ঘাড়ে রোম, প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তক প্রণয়ন করেন।

কিছু দিন পর্য্যন্ত বঙ্গমাতার প্রিয়তম পুত্র কবিকুল শিরোমণি মধুসূদন, তাঁহার সুমধুর বীণার রবে বঙ্গবাসীর শ্রবণ-যুগল পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্য বশতঃ দেখিতে দেখিতে বঙ্গাকাশের সেই উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্রটি সহসা ধরাতলে খসিয়া পড়িল। সর্ব্বসুখহন্তা কুটিল কাল সাহসা বঙ্গবাসীর

হরিষে বিষাদ ঘটাইল। মধুর হস্তস্থিত মধুর বীণা ভূতলে নিপতিত হইল। সুতার ছিন্ন হইল, সুমধুর রব নীরব হইল। অনতিবিলম্বে বঙ্গবাসীকে অকূল শোক-সাগরে এবং তাঁহার কতিপয় শিশুসন্তান অসীম দুঃখনীরে নিমগ্ন করিয়া, কবিকুল ভাস্কর শ্রীমধুসূদন মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করতঃ শান্তিময় স্বর্গধামে গমন করিলেন।

"বঙ্গের পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।"

শ্রীমধুসূদন স্বর্গধামে গমন করিলেন। অমনি স্বর্গীয় দ্বার সজোরে উদ্ঘাটিত হইল। শ্রাবণের বারিধারা সদৃশ তাঁহার মস্তকোপরি অজস্র পুষ্প বৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল। বিদ্যাধরগণ চামর হস্তে কবির আগমন প্রতিক্ষায় দণ্ডায়মান। সহসা শ্রবণ বিমুগ্ধ কর স্বর্গীয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কোকিল কণ্ঠা অপ্সরী, কিন্নরী ও বিদ্যাধরীগণের সুমধুর সঙ্গীত রবে ত্রিলোক আন্দোলিত হইতে লাগিল। কবিকুল-চূড়ামণি মধুসূদন, জগতে সুদৃঢ় কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করতঃ পুষ্পরথে আরোহণ-পূর্ব্বক শান্তিধামে গমন করিলেন।

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ প্রভাবে, সেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কবি, মৃত্যুকালে সমুদায় ধন সম্পত্তি হারা হইয়া, নিঃস্ব অবস্থায়, অতি কষ্টে দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

"কবিবর! কি কহিব? বিদরে হৃদয়,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ?

তাঁহার অন্তিম কালের সেই শোচনায় অবস্থা, বঙ্গবাসীগণের একটী প্রধান কলঙ্ক-রেখা চিরকাল বঙ্গের ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

তাঁহার পরলোক গমনে প্রত্যেক বঙ্গবাসী অকূল শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সহৃদয় ব্যক্তিগণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে, মধুসূদনের স্বর্গগমন উল্লেখে বহুল শোকপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিশ্রেষ্ঠ নবীনচন্দ্র সেন ব্যথিত হৃদয়ে শোকব্যঞ্জক দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের দুঃসহনীয় শোক-সন্তাপ প্রশমিত করিলেন। সমাজের কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্তাপিত চিত্তে স্বর্গীয় কবির যশকীর্ত্তন করতঃ নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যথা :—

"কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি, হইল রে এতদিনে।
কুহকী কল্পনা বলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কামিনী কুঞ্জকমলে, মোহিতে রসিক জনে।
ঘোর নাদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে
কান্দিবে প্রমীলা সতী কেলি বিপিনে।"

মধুসূদনের পরলোক গমনান্তে, তাঁহার প্রকাশিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য দর্শনে, সমাজের বহুল ব্যক্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে পুস্তক প্রণয়ন করতঃ স্বর্গীয় কবির গম্য পথে অগ্রসর হইতে নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত

পথে পদার্পণ করা দূরে থাকুক, সেই দুর্গম পথের ভীষণত্ব দর্শনে সকলেই ভীত চিত্তে পশ্চাৎ গমন করিলেন।

যদিচ বঙ্গমাতার প্রিয় পুত্র মধুসূদন কবির বিচিত্র আসন শূন্য করতঃ স্বর্গধামে গমন করিলেন, কিন্তু বঙ্গবাসীর সৌভাগ্য বলে সে আসন আর অধিকদিন শূন্য থাকিল না। অচিরকাল মধ্যেই কবিশ্রেষ্ঠ হেমচন্দ্রের সুমধুর ভেরী সুললিত স্বরে বাজিয়া উঠিল। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই কবি প্রধান নবীনচন্দ্র সেনের সুধাময়ী সপ্তস্বরা নিনাদিত হইয়া বঙ্গবাসীর শোকদগ্ধ হৃদয়ে অজস্র ধারে সুধাবর্ষণ করিতে থাকিল। বঙ্গবাসীর মন প্রাণ আশ্বস্ত, এবং কবির শূন্য আসন পূর্ণ হইল।

হেমবাবু ও নবীন বাবু বহুল সুমধুর গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ সমাজে অসীম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে হেমবাবুর ভারত-সঙ্গীত, ও নবীন বাবুর পলাশীর যুদ্ধ প্রসংসনীয়। হেম বাবুর ভারত সঙ্গীত যথা—

"শিখরে দাঁড়ায়ে গায় নামাবলী গাইতে লাগিল জনৈক যুবা।

নানা কারণে গ্রন্থের অন্যান্য অংশ আলোচনায় ক্ষান্ত হওয়া গেল।

নবীন চন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ পাঠ করিলে গ্রন্থের সুমধুর রচনা, জ্বলন্তভাব, গূঢ় উপদেশ প্রভৃতি পাঠ করিয়া পাঠকের হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দনীরে পরিপ্লুত হইতে থাকে। মন্ত্রণা ভবনে স্বর্গীয়া রাণী ভবানীর অতুলনীয় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত

থাকিতে পারেন? যথা :—

"রাণীর কি মত শুনি সুপ্তোত্থিত প্রায়।
কহিতে লাগিলা রাণী ভবানী তখন।
আমার কি মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
শুনিতে বাসনা যদি বলিব এখন।

* * * *

শীতলিতে নিদাঘের আতপ জ্বালায়।
পাপক শিখরে পশে কোন্ অভাজন?

* * * *

মেঘাবৃত রবি যদি এত তেজোময়।
মেঘ মুক্তে না হইবে তেজস্বী কেমন।

* * * *

কেন আর খাল কেটে আনিছ কুমীরে।

* * * *

কি কহিব মহারাজ আমি যে রমণী।
বহিছে বিদ্যুৎ বেগে আমার ধমনী।"

যুদ্ধে পতিত মোহনলালের উৎসাহপূর্ণ বাক্য যথা :—

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন।
দাঁড়াও ক্ষত্রীয়গণ, যদি দেহ ভঙ্গ রণ।
গর্জ্জিল মোহনলাল নিকট শমন।
এইবার রণে যদি কর পলায়ন।
মনেতে যানিও স্থির, কার না থাকিবে শির।

সবান্ধবে যাবে সবে শমন ভবন।
বীর প্রসবিনী যত মোগল রমণী।
নাহি জানি কি প্রকারে, প্রসবিলা কুলাঙ্গারে।
শৃগালের সুত সব সিংহের রমণী। ইত্যাদি।

উক্ত গ্রন্থে মোহনলালের ও রাণী ভবানীর বক্তৃতা এবং অন্যান্য অংশ অতীব প্রতিপ্রদ ও যারপর নাই প্রশংসনীয়, বিশেষ কারণে গ্রন্থেব বিস্তারিত উল্লেখে ক্ষান্ত থাকিলাম।

তাহার অল্পদিন পরেই বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক কবিশ্রেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নানাবিধ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করতঃ বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিতে থাকিলেন। তাহার প্রণীত অতি সরল ও সুমধুর একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"জগত মোহিনী ঊষা আগত অবনী তলে।
নয়ন মেলরে শিশু জয় জগদীশ বলে।
গাছে গাছে ডাকে পাখী উঠ উঠ উঠ বলে,
ললিত মধুর তানে, পাখীর মধুর বোলে,
কত আর ঘুমে রবে, আঁখি মেলে উঠ এবে,
আঁখি ভ'রে দেখ শোভা, জয় জগদীশ বলে।
ঊষার মোহন হাসি, চেয়ে দেখ ফুলে ফুলে,
ঊষার কনক আভা, খেলে কিবা দুলে দুলে,
ফুলে ফুলে কিবা শোভা, কি মাধুরী মনোলোভা
হাসরে ফুলের হাসি, জয় জগদীশ বলে॥

বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন কবির কল্পনা-প্রসূত দুই এক খণ্ড পুস্তক সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। বাহুল্য প্রযুক্ত উল্লেখে ক্ষান্ত থাকা গেল।

বিবিধ পুস্তক।

তৎ সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সমাজে বহুবিধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে তৎকালের প্রচারিত কতকগুলি পুস্তক অদ্যাপি সমাজে প্রচলিত আছে। আর কতকগুলি পুস্তক বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, তাহার মুদ্রাঙ্কন পর্য্যন্ত বিলোপ হইয়াছে। যে সকল পুস্তক এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার কয়েকখানি পুস্তকের কথঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

ভারত উদ্ধার কাব্য—এই পুস্তকখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ছিল। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। পুস্তকখানির আদ্যন্ত অতীব রহস্যজনক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। পুস্তকখানির বিষয় এই :—

কতিপয় উৎসাহশীল ও বিকৃত মস্তিষ্ক যুবা পুরুষ, ভারত উদ্ধার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। একটি ভগ্ন অট্টালিকার অন্ধকারময় এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ তাহাদের মন্ত্রণা গৃহ সংস্থাপিত হইল। "কড়ি কাষ্ঠ ভাঙ্গে বুঝি, দড়ি কিম্বা ছেঁড়ে". উক্ত গৃহে সকলে একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা

করিলেন, ভীষণ যুদ্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে পরাজয় করতঃ ভারতরাজ্য হস্তগত করিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে দুইটি প্রস্তাব করা হইল। প্রথম প্রস্তাব, সুয়েজ খাল শুষ্ক করা হইবে। তাহা হইলে ইংলণ্ড হইতে এদেশে যুদ্ধ জাহাজ আর আসিতে পারিবে না। ২য় প্রস্তাব, যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ। যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে পীচকারী ও বঠি এবং পটকা বাজি ইত্যাদি।

এই প্রস্তাব স্থির করিয়া জনৈক যুবা সুয়েজ খাল শুষ্ক করিতে প্রচুর পরিমাণে "যবের ছাতু" লইয়া সুয়েজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অন্য কয়েকটি যুবা বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ কুঠার লইয়া বাঁস সংগ্রহ জন্য দিনাজপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অন্যান্য যুবা কেহ বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া 'বঠি' সংগ্রহ করিতে থাকিলেন। কেহ কেহ বা কলিকাতার বাজার হইতে রাশিকৃত 'পটকা বাজি' ক্রয় করিতে লাগিলেন।

অচিরকাল মধ্যেই সুয়েজ খালে যবের ছাতু ঢালিয়া দেওয়ায়, সুয়েজ খালের সুগভীর জলরাশি শুষ্ক হইয়া গেল। দিনাজপুর হইতে বাঁশ সংগ্রহ করিয়া অসংখ্য পীচকারী প্রস্তুত করা হইল। এবং বস্তা বস্তা লঙ্কা মরিচ সঞ্চয় করিয়া, লঙ্কা পেষণ করতঃ লঙ্কা "লোসন" প্রস্তুত হইতে লাগিল। সমস্ত কার্য্য ঠিক হইয়া গেল, পর দিন প্রভাতে কেল্লা আক্রমণ ও ভীষণ যুদ্ধে ইংরাজ সেনা ও সেনাপতিদিগকে পরাজয় করা হইবে। এই প্রস্তাব ঠিক করিয়া সকলেই স্বীয় স্বীয় গৃহে গমন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। সূর্য্যদেব যেন যুদ্ধ রহস্য সন্দর্শন মানসে

দ্রুতপদ বিক্ষেপে পূর্ব্ব গগনে উদয় হইলেন। তখন যুবা দলের সেনাপতি মহাশয় জলদনাদে সমুদায় যুবা সেনাদিগকে, উৎসাহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক আহ্বান করিতে থাকিলেন।

"উঠ সবে মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
ভারত উদ্ধারে মন করহ নিবেশ।"

তৎশ্রবণে সমুদায় সেনাগণ যুদ্ধ শয্যায় সজ্জিত হইলেন। শান্তিপুরের কাল ফিতা পেড়ে ধুতি পরিধান, গায়ে টাইট কোট, ঢাকাই উর্ণা কেচাইয়া কটিদেশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করতঃ বার্ণীস জুতা পায়ে দিয়া,মস্তকের কেশ দশ আনা ছয় আনা রকমে বিভক্ত করিয়া,সরল সামন্ত বলিয়া বীর বেশ ধারণ করিলেন। তৎপর কেহ মিছরি পানা, কেহবা দুখানা লুচি ও কিঞ্চিৎ মোহন ভোগ, কেহবা কিঞ্চিৎ চিনির শরবত পান করিয়া পদভরে বসুধা কম্পিত করতঃ রুদ্রবেশে সেনাপতির সদনে উপনীত হইলেন। জনৈক যুবা হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তাঁহার পত্নীকে বলিলেন, আমি যুদ্ধে গমন করিব। তাহার পত্নী ঈদৃশ বচন শ্রবণে কম্পিতাঙ্গ হইয়া বলিতে লাগিলেন সেকি? আমি তোমাকে কখনই যুদ্ধে যাইতে দিব না। কিন্তু বঙ্গবাসীর প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হইবার নহে। যুবাকে যুদ্ধে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার পত্নী গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন।

"প্রাণনাথ নিতান্তই যুদ্ধে যাবে তুমি।
রান্ধিয়া দেই দুটো আলুসিদ্ধ ভাত।
খাইয়া যাইবে তুমি যুদ্ধ করিবারে।"

তখন পতিব্রতা নারী আলু ও বেগুন সিদ্ধ, দুটো সিদ্ধ পোড়া

ভাত ও তাহাতে কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃত দিয়া স্বামীকে আহার করিতে দিলেন। যুবা আহারান্তে খদির ও কর্পূর সিক্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে যুদ্ধে গমন করিলেন।

তৎপর সকলে একত্রিত হইয়া, কেহবা বৃহদাকার পীচকারী স্কন্ধে ধারণ করতঃ, কেহবা পটকা বাজী হস্তে লইয়া, কেহ কেহবা লঙ্কা লোশনের কলশী মস্তকে তুলিয়া সদর্পে যুদ্ধে ধাবিত হইলেন। কোন কোন বীরপুরুষ সুতীক্ষ্ণ বটী হস্তে লইয়া সগর্ব্বে ও উচ্চৈ-শ্বরে বলিতে লাগিলেন "বঠাইয়া দিব যত ভারতের ইংরাজে" অনতিবিলম্বে যুবাগণ "ফোটউইলিয়াম" দুর্গ সম্মুখে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। ঘন ঘন সিংহনাদে অনন্ত গগন কম্পিত করিয়া তুলিলেন।

সহসা এতাদৃশ বীরদাপ শ্রবণে দুর্গের সিপাহীগণ কেল্লার মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। এবং বাঙ্গালী যুবাগণের ঈদৃশ হাস্যজনক কার্য্য দর্শনে সকলে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল। তখন যুবাগণ সেনা-পতির আদেশে লঙ্কালোশন, পূর্ণ করিয়া কেল্লার মধ্যে অসংখ্য পীচকারী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রাবণের বারি-ধারা সদৃশ প্রচুর লঙ্কা লোশন বর্ষিত হওয়াতে, সিপাহীগণ ঘন ঘন হাঁচিতে হাঁচিতে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। অচিরে যোদ্ধা-গণ অগ্নি সংযোগে রাশি রাশি পটকাবাজী কেল্লার মধ্যে ছুঁড়িতে লাগিলেন। পট্‌কার অগ্নিতে কেল্লার সঞ্চিত বারুদ ও গোলা-গুলি বৃহদাকার কামান, বন্দুক ও কেল্লার সুদৃঢ় প্রাচীর এবং উন্নত অট্টালিকা সমুদায় দগ্ধ হইয়া গেল। তখন বীরপুরুষগণ কেল্লার

মধ্যে প্রবেশ করতঃ বর্ঠির আঘাতে সমুদায় সেনা ও সেনাপতি-দিগকে পরাজয় করিয়া উন্নত জয় পতকা তুলিয়া ভারতভূমি অধিকার করিলেন। (ইতি ভারত-উদ্ধার নামা কাব্য সমাপ্তহং)

কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব নাটক—ইহাতে তৎ সময়ের কুলীনগণের বল্লাল-প্রদত্ত কৌলীন্য মর্য্যাদার বিষয় অতি বিশদ রূপে উল্লেখ আছে। যথা কুলানদিগের বহু বিবাহ, একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালকের হস্তে চারি পাঁচটী প্রাপ্তবয়স্কা পাত্রী সম্প্রদান, অনূঢ়া রমণীগণের নানাবিধ প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়।

পুস্তক খানি কোন স্থানে পদ্য ও কোন কোন স্থলে নাটক ছন্দে লিখিত। পদ্য ছন্দে উত্তম ও অধম ফলারের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা।—

"ঘিয়েভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই।
থাজা গজা ছানাবড়া, রসগোল্লা রসকরা
উত্তম ফলার এরে কই।
গুমো চিড়া জলা দই, বর্ত্তমান ফাকা থই
রৌদ্রেতে মাথা ফাটে, হাত দিয়ে পাত চাটে
অধম ফলার এরে কই।

বহু বিবাহ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, যথা—তথন কুলানগণ পঞ্চাশ ষাট এবং তদূর্দ্ধ সংখ্যাও বিবাহ করিতেন। শ্বশুর বাটি ঠিক রাখিবার জন্য সকলের এক একটি খাতা থাকিত। যখন শ্বশুর

বাটী যাইতেন, তখন খাতা দেখিয়া শ্বশুর বাড়ী ঠিক করিয়া বাহির হইতেন।

একটী ফুলে মেলের মুখটি বংশীয় বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, খাতা দেখিয়া একটী শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করিলেন। তখন রেল পথ ছিল না, সুতরাং তিনি পদব্রজে গমন করিয়া, কয়দিন পর শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে পৌঁছছিয়া, দেখিলেন একটী দশ এগার বর্ষীয় বালক একখানি বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। মুখর্য্যা মহাশয় বালক-টীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুকের কোন্ বাড়ী?

বালক। এই বাড়ী, আপনার নিবাস কোথায়?

মুখর্য্যা। অমুক গ্রাম।

বালক। আপনার নাম কি?

মুখর্য্যা। অমুক মুখোপাধ্যায়।

সহসা বালক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল 'আসুন এই বাড়ী।'

মুখর্য্যা। তিনি বাড়ী আছেন?

বালক। আজ্ঞে তিনি অনেক দিন মারা গিয়াছেন। কেন, এসংবাদ আপনি জানেন না?

মুখর্য্যা। কই আমিত কিছুই জানি না। তাঁহারাও কোন চিঠি পত্র লেখেন নাই, আমিও প্রায় বার তের বৎসর হইল এখানে আসিতে পারি নাই। কি করে এ সংবাদ জানব বল?

তখন বালক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া

বলিল, "বাবা এসেছেন।" শুনিবা মাত্র বাড়ীতে মহা আমোদ আহ্লাদ উপস্থিত হইল।

আর একটী চট্টোবংশীয় কুলীন, শ্বশুর বাড়ী গমন করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ তিনি পথ ঠিক করিতে না পারিয়া পিছন দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কক্ষদেশে একটী ভগ্ন ছত্র, বাম হস্তে ছিন্ন চট্টোপাধ্যায় জোড়া, ডাইন হাতে হুকা কল্কী, পিষ্ঠ দেশে একটী 'পিট্ বোচ্কা' (তখন ব্যাগ ছিলনা, সুতরাং সঙ্গীয় কাপড় পিঠ বোচ্কায় লইতে হইত) একখানি মলিন চাদর মাথায় পর্গ বন্ধন, পরিধান ধূতি খানি ও অতি জীর্ণ ও মলিন, সহসা এই অপূর্ব্ব জানোয়ার, বাড়ীব মধ্যে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন "কে যেন বাড়ীর মধ্যে এলো।" বলা মাত্র, তাঁহার শ্বশুর ও দুই শ্যালক দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বাটীর মধ্য হইতে বাহির করিলেন এবং কিছু কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম প্রদান করিতেও ত্রুটী করিলেন না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিষম বেগতিক দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন, "আমার নাম অমুক চট্টোপাধ্যায়, নিবাস অমুক গ্রাম" শ্রবণ মাত্র তাঁহার শ্বশুর অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "এস এস বাবা এস, চিন্‌তে পারি নাই, শ্যালকদ্বয়, আসুন আসুন ক্ষমা করুন, প্রায় সাত আট বৎসর হইল এবাটীতে পদার্পণ হয় না, কেমন করে চিন্‌ব বলুন। চলুন বাটীর মধ্যে চলুন, তখন কেহ ছাতাটী হাতে নিলেন, কেহ হুকা কল্কী, কেহ কেহবা পাদুকা

জোড়া হাতে লইয়া দেবতাধিক ভক্তি সহকারে সকলে কুলীন জামাইকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, বড় ঘরের বারেণ্ডায় একখানা জলচৌকির উপরে বসিলেন। তাঁহার শ্বশ্রুঠাকুরাণী অৰ্দ্ধ অবগুণ্ঠনে মুখখানি আবৃত করিয়া, একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালক তাঁহার কোলে দিয়া, কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগলেন—

"খুকির এই প্রথম ছেলে, কত আদরের, সকল সময়েই বাবা বাবা বলে, বিয়ের পর সাত আট বৎসর চলে গেল, একবারও কি আস্‌তে হয় না ?"

আর একটী কুলীনের শ্বশুর বাটী হইতে একজন পত্রবাহক একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হাতে দিল, তিনি পত্র খানি খুলিয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বশুর লিখিয়াছেন, "আগামী অমুক তারিখে আপনার নবকুমারের শুভ অন্নারম্ভ, পত্রবাহকের সঙ্গে অবশ্য অবশ্য আসিবেন।" পত্রখানি পাঠ করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একেবারে "তেলে বেগুনে" জ্বলিয়া উঠিলেন, উচ্চ চীৎকার শব্দে বাড়ীখানি কাঁপাইয়া তুলিলেন, এক একবার পত্র বাহককে প্রহার করিতে উদ্যত হইতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার পিতা বাটীতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"কি হয়েছে ?" তখন তাঁহার পুত্র বলিতে লাগিলেন, "দেখুন পাজি বেটাদের তামাসা, বিয়ের পর আমি তিন চারি বৎসর সেখানে যাই নাই, আজ আমার ছেলের অন্নারম্ভের সংবাদ"তৎশ্রবণে তাঁহার পিতা বলিতে লাগিলেন,"না না এদের ত ভদ্র লোকই বলা যায়, তোমার জন্মার সংবাদ, তোমার বিয়ের

সময় আমাকে দিয়েছিল।” উক্ত পুস্তকে এইরূপ নানাবিধ রহস্য-জনক ঘটনার উল্লেখ আছে।

নয়শ রূপইয়া—এই পুস্তক খানিতে সমাজের শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-গণের কন্যাপণ গ্রহণের বিবিধ প্রসঙ্গ রহিয়াছে। কোন ব্রাহ্মণ “নয়শত টাকা” কন্যাপণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎ উল্লেখে ঐ পুস্তক খানি প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালী সাহেব—আমাদের দেশীয় জনৈক যুবা “সিভিল সার্বিস,” পরীক্ষা পাশ করিয়া ইংলণ্ড হইতে দেশে প্রত্যাগত হইয়া, নানা প্রকার সাহেবী চালচলন প্রদর্শন করেন। তদুপলক্ষে এই পুস্তক খানি প্রচারিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে পুস্তক খানি প্রায় দেখা যায় না। পুস্তক খানির বিষয় এই—

“গোপাল ইংলণ্ড হইতে“সিভিলিয়ান”পরীক্ষা পাস করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইলেন। ইংলণ্ডে গমন জন্য গোপাল সমাজচ্যুত ছিলেন। গোপালের পিতা রামধন বাবু গোপালকে সমাজে চালাইবার জন্য; আপন বৈঠকখানায় বসিয়া পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে নানারূপ পরামর্শ করিতেছেন।”

রামধন। পুরোতঠাকুর মশায়! আমার গোপাল যাতে সমাজে দশ জনার সঙ্গে চল্‌তে পারে, তার একটা উপায় করুন।

পুরোহিত। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) রামধন বাবু! তা হতে পারে, এ বিষয়ে শাস্ত্রে অতি পরিষ্কার ব্যবস্থা আছে।

রাম। (ব্যস্তসহকারে) কি ব্যবস্থা আছে? বলুন, তাই করা যাবে।

পুরো। রঘুনন্দন, স্মৃতি শাস্ত্রে লিখিয়াছেন—

"ম্লেচ্ছ বাস পরিধানং
ম্লেচ্ছ দেশে নিবাসিনং।
ম্লেচ্ছ—খাদ্য ভোজনাঞ্চ—
পুনঃ সংস্কার মর্হতি।

বাবুর একটা প্রায়ঃশ্চিত্ত কর্‌তে হবে।

রাম। কি রকম কর্‌তে হবে?

পুরো। কিছু বেশী পরিমাণ তাম্র উৎসর্গ, ও দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দেওয়া।

রাম। কর্‌বো কর্‌বো আমি সবই কর্‌বো।

পুরো। আর বাবুকে কিঞ্চিৎ গোময় ভক্ষণ করতে হবে।

রাম। সবই হবে। আপনি উদ্যোগী হন।

পুরো। আচ্ছে গোপাল বাবুকে একবার ডাকুন দেখি।

রামধন বাবু অন্তঃপুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, গোপাল! গোপাল! বলিয়া ডাক দেওয়ায় কোট পেণ্ট্‌লেনধারী, বুট জুতা পায়, সোলার টুপি মাথায় দিয়া, চুরট্‌ টানিতে টানিতে, গোপাল আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। এবং পাঝুলাইয়া একখানি চৌকির উপর বসিলেন। গোপালকে দেখিবা মাত্র রামধন বাবু বলিলেন, গোপাল! বাবা! পুরোত ঠাকুরকে প্রণাম কর।" গোপাল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চুরট্‌ টানিতে লাগিলেন।

পুরো। গোপাল বাবু বাড়ীতে কবে আসা হলো? শরীর ভাল আছেত?

গোপাল। (ঈষৎ হাস্থ করিয়া) হামি বাঙ্গালা ভাল বোঝেনা।

পুরো। (স্বগতঃ) বিলক্ষণ ! বাঙ্গালীর ছেলে কয়েকদিন বিলাতে থেকেই বাঙ্গালা বোঝেন না (প্রকাশ্যে) বলি শরীরত সুস্থ আছে ?

রাম। পুরুত ঠাকুর মশায় ? গোপাল আমার অনেকদিন বিলাতেছিল, বাঙ্গালা কথা অনেক ভুলে গেছে।

পুরো। (গোপালের দিকে দৃষ্টি করিয়া) বেলাত স্থানটা কেমন ?

গোপাল। ভাল আছে।

পুরো। জল বায়ু কেমন ?

গোপাল। খুব বাড়িয়া আছে।

পুরো। সহরটা দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন ? সেখানে কি কি আছে ?

গোপাল। বহুট বড় বড় (বিল্ডিং) আছে, বড় বড় (রোড) আছে, ভাল ভাল সাহেব লোক, মেম লোক আছে। আর আছে প্রজাদের সভা, রাজার সভা, রাজা কোন অন্যায় বিচার কর্‌লে প্রজারা তাহার প্রতিবাড করে !

পুরো। (সবিস্ময়ে) সেকি ? রাজার কার্য্যে আবার প্রজাদের প্রতিবাদ ? শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, "দীল্লিশ্বরবা জগদীশ্বরবা" রাজা ঈশ্বর তুল্য, তাঁর কার্য্যে প্রজার আপত্তি ?

গোপাল। সেখানে সেকঠা নাই ?

পুরো। সেখানে গিয়া কোথায় ছিলেন ?

গোপাল। হোটেলে।

পুরো। আহারাদি কি হতো ?

গোপাল। গরু খাইটাম, শুয়র খাইটাম, রুটি খাইটাম।

পুরো। (কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া) রাম, রাম, রাম, মহাভারত, মহাভারত, মনে করেছিলেম কিঞ্চিৎ গোময় ভক্ষণ করলই হবে, তা বাবু যে কথা বল্লেন, এতে গোময়ের হ্রদে ডুবিলেও নিস্তার নাই।

গোপাল। (সক্রোধে পুরুত ঠাকুরের প্রতি পদাঘাত উত্তোলন পূর্ব্বক) ড্যাম, রাস্কেল, ননসনস্, আমাকে গরুর গু খাইটে বলিস্ ?

পুরো। (ভয়ে কম্পিতাঙ্গ হইয়া) মধুসূদন! মধুসূদন! মধুসূদন!

রাম। (যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও লজ্জিত হইয়া গোপালের প্রতি,) পাজি! বেল্লিক! এখান থেকে দূরহ। তোর এমন সিভিলিয়ানের মুখভরে আমি প্রস্রাব করে দেই। রামধন বাবুর অতিশয় ক্রোধ দর্শনে, হুট হাট করিয়া পদসঞ্চালন পূর্ব্বক গোপাল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রামধনবাবু লজ্জিত হইয়া অধোবদনে বসিয়া থাকিলেন। গরিব পুরোহিত ঠাকুর আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করতঃ কিঞ্চিৎ আড়ালে গিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দুর্গা দুর্গা দুর্গা মা! বাচ্‌লেম, যে অসুরের হাতে পড়েছিলাম" বলিতে বলিতে গৃহে গমন করিলেন।

ইহার পরের দিনে, গোপাল অতি সভ্য ভব্য শিষ্টশান্ত হইয়া দর্শকগণকে দেখা দিলেন।

বিবাহ বিভ্রাট নাটক—একটী উপযুক্তা ও অতি সুশিক্ষিতা রমণীর একজন অল্প শিক্ষিত ও পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়। তদুপলক্ষে এই নাটক খানা লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে স্ত্রী স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে। একটী 'সিনে' গাউন-পরিধানা স্ত্রী, টেবিল সাম্‌নে চেয়ারে উপবিষ্টা হইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান স্বামীকে, চা গরম, খাদ্যাদি প্রস্তুত কার্য্যের বিজ্ঞানোক্ত উপদেশ ও স্বামীর কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহের ত্রুটিতে তীব্র ভৎর্সনা করিতে-ছেন, এবং তজ্জন্য আক্ষেপোক্তি প্রকাশ। ইত্যাদি দৃশ্য বঙ্গবাসীর চক্ষে কণ্টকবিদ্ধ বৎ অনুভব হয়। এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রসঙ্গ পূর্ণ রহিয়াছে। অনেক যাত্রার দলে গানের শেষ এই নাটক খানি "ফার্শ" স্বরূপে অভিনয় করা হইত।

হরিশ্চন্দ্র নাটক বাবু মনোমোহন বসুর প্রণীত। বর্ত্তমান সময়ে এই নাটকখানির রূপান্তর করা হইয়াছে।

নাটক খানিতে গ্রন্থকার মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের নিঃস্বার্থ ত্যাগ স্বীকার ও অনির্ব্বচনীয় দানশীলতার, পরিব্রতা মহারাণী শৈব্যার অকৃত্রিম পতিভক্তির পরিচয়, পাতঞ্জল ও খগা পাগ্‌লার উচ্চ হৃদয়ের নানাবিধ বক্তৃতা; এবং রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের অতি গূঢ় ভাবে হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্ম পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয় অতি উৎকৃষ্ট রূপে আলোচনা করিয়াছেন। এবং একটী সঙ্গীতে দেশের দুরবস্থা অতি বিসদরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

"দিনে দিন সবে দীন ভারত—

অন্না ভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনুক্ষীণ।

তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার, সুতা জাতা ঠেলে

অন্নমেলা ভার, দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, ঘট্‌লো দেশের কি দুর্দ্দিন।

সূচ সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে, দিয়াশলই কাঠি তাও আসে পোতে, প্রদীপটী জ্বালিতে, খেত শুতে যেতে, কিছুতে না লোক স্বাধীন ঃ।

আজি যদি বঙ্গ ছাড়ে তুঙ্গ রাজ, কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ, ধর্‌বে কি লোক তবে দিগাম্বরের সাজ, বাকল টেনা ডোর কপীন।

হুতুম পেঁচার নক্‌সা—এই পুস্তক খানিতে কলিকাতার অতি গূঢ় বৃত্তান্ত সমুদায় উল্লেখ ছিল। কিন্তু পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তার নাম ছিল না।

আপনার মুখ আপ্‌নি দেখ; উপযুক্ত ভাইপোস্থ; এই-রূপ অনেক বথামির পুস্তক তখন সমাজে প্রকাশিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে সকল পুস্তক বিলুপ্ত।

আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস। তখন সমাজে এই দুই খানি পুস্তক বিশেষ আদরণীয় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে আর তাদৃশ আদর নাই। কিন্তু পুস্তক দুই খানি এখনও বর্ত্তমান আছে।

গদ্য—

মহাভারত ও রামায়ণ—অতি প্রচীন সময়ে কাশীদাসের

পদ্য মহাভারত ও কীর্ত্তিবাসের পদ্য রামায়ণই সমাজে বিশেষ আদরণীয় ছিল। তখন গদ্য মহাভারত ও রামায়ণ দেশে প্রকাশিত ছিল না। তৎপর পরম বিদ্যোৎসাহী বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কৃত সংস্কৃত মহাভারতের গদ্য অনুবাদ করতঃ স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। তৎপর বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে মূল মহাভারতের গদ্য অনুবাদ করা হয়। এবং তৎসময়েই পরম উৎসাহশীল প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয় মহাভারতের আর একখানা গদ্য অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই তিন খণ্ড মহাভারতই দেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তিনখণ্ড পুস্তকই গদ্যে রচিত হয়। এই তিন খানি মহাভারত মধ্যে কালিপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাহার ভাষা অতি কঠিন, সহজে ও সকলের তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা কঠিন। ১২৮০ সালে রামায়ণ গদ্যে প্রকাশ হয়। এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও বহুল তন্ত্রও বঙ্গানুবাদ হইয়াছে।

স্ত্রী পাঠ্য পুস্তক—তখন সমাজে মহিলাদিগের পাঠের উপযুক্ত নরনারী ও সুশীলার উপাখ্যান, এই দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত পুস্তক দুইখানি আর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সম্প্রতি কতিপয় সমাজহিতৈষী ব্যক্তি ও বহুল শিক্ষিতা রমণী মহিলাদিগের পাঠোপযোগী, ভারতীয় বিদুষী, আর্য্য পাঠ, খুলনা, বেহুলা, সতী প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি বর্দ্ধন করিয়াছেন।

এতৎভিন্ন এক্ষণে বহুল উপন্যাস সমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা, মডেল ভগ্নী, খুনে খুন, হরিদাসের গুপ্তকথা, চোরেরউপর বাটপারী, ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মদৈত্য, মধুমালা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি কিন্তু এই সকল পুস্তকগুলি পাঠকগণের হস্তে কমই দৃষ্ট হয়। এবং এতৎব্যতীত ভোজবাজী, ভেল্কীবাজী এবং গান বাজনা শিক্ষা প্রভৃতি বহু সংখ্যক পুস্তক দেশে প্রকাশিত হইতেছে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক।

বাঙ্গালা অক্ষর পরিচয়—তখন সমাজে প্রথম শিক্ষার জন্য "শিশু-বোধক" নামে একখানা পুস্তক প্রকাশিত ছিল। উক্ত পুস্তক হইতে বালকগণ প্রথমতঃ অক্ষর পরিচয়, ফলা বানান, শতকিয়া, গণ্ডাকিয়া, সেরকিয়া, নামতা প্রভৃতি শিক্ষা করিত। তৎপর স্বদেশ-হিতৈষী মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ" এবং ভক্তিভাজন স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহোদয় "শিশুশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগ" প্রকাশ করত বালকগণের বর্ণপবিচয়ের সুপন্থা বিস্তার করিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত সমাজের প্রথম শিক্ষার জন্য, বর্ণপরিচয় ও শিশুশিক্ষা পুস্তকই নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অক্ষর পরিচয়ের জন্য দেশে বহু সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। যথা বর্ণ-বোধ, অক্ষর পরিচয়, শিশুতোষ, হাসি খুসি, খোকার হাসি, মোহোনভোগ, খাজা গজা ইত্যাদি ঐ সকল পুস্তকগুলি পাঠকের

মনোরঞ্জন মানসে, লেখকগণ পুস্তকের অক্ষরগুলি, নীল, লোহিত, সবুজ প্রভৃতি কালীদ্বারা মুদ্রিত ও পুস্তকের মধ্যে বহুসংখ্যক ছবি প্রদান এবং মলাটে নানাবিধ লতা পাতা ফুল ফলের বিচিত্র চিত্র, পুস্তকের মধ্যে বহুবিধ কবিতা, বহুল সঙ্গীত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু অভিনব উচ্চ শিক্ষিত ও উদ্যমশীল গ্রন্থকারগণ যতই কেন যত্ন ও চেষ্টা করিয়া পুস্তক মধ্যে কবিতাবলী সন্নিবেশিত করুন না কেন, কিন্তু সেই স্বর্গীয় কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাত্মার অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত শিশুশিক্ষা ১ম ভাগে "কাল কাক ভাল নাক; বারমাস তার দাস; ঋণদায় তৃণ খায়, ইত্যাদি এবং পুস্তকের শেষ ভাগে, 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' যে সরল ও সুমধুর কবিতাটী লিখিত আছে, তাদৃশ চিত্তবিমুগ্ধকর কবিতা এপর্য্যন্ত কোন পুস্তকেই প্রকাশিত হয় নাই। এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল।

সাহিত্য—তৎসময়ে অক্ষর পরিচয় শেষ হইলে, তৎপর (গদ্য) বোধদয়, নীতিবোধ, টেলিমেকস্, চারুপাঠ তিনখণ্ড, রাসেলাস, সীতারবনবাস, শকুন্তলা, কাদম্বরী, রঘুবংশ, ধর্ম্মনীতি, রামের রাজ্যাভিষেক এবং (পদ্য) কবিতাবলী, নীতিসার, সদ্ভাব-শতক, পদ্যপাঠ ৩য় খণ্ড, মিত্র-বিলাপ, কবিতা-কদম্ব, নির্ব্বাসিতা সীতা ইত্যাদি পুস্তক প্রচলিত ছিল এবং চারুপাঠ ৩য় ভাগ, সীতার বনবাস ও পদ্য পাঠ তৃতীয় ভাগ, মিত্র বিলাপ প্রভৃতি পুস্তক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল।

ব্যাকরণ—অতি প্রথমে "কীথ্ সাহেবের ব্যাকরণ, ব্রজকিশোর

গুপ্তের ব্যাকরণ, ক্রমশঃ ব্যাকরণ সার, উপক্রমণিকা, সাহিত্য, প্রবেশ ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রচলিত হয়।

ইতিহাস—বিদ্যাসাগর-কৃত বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, কৃষ্ণচন্দ্রের প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার ইত্যাদি।

গণিত—গণিত, গণিতাঙ্কসার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রণীত পাটিগণিত ইত্যাদি।

ভূগোল—ভূগোল পরিচয়, ভূগোল বিদ্যাসার, তারিণী-চরণের ভূগোল বিবরণ, ক্রমশঃ ভূগোল সূত্র, ভূগোল পরিচয় ইত্যাদি।

বিজ্ঞান—অক্ষয়চন্দ্র দত্ত কৃত পদার্থ বিদ্যা, বস্তু পরিচয় ইত্যাদি।

ক্ষেত্র-তত্ত্ব—স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত ক্ষেত্র-তত্ত্ব, রাজমোহন দাস প্রণীত, ক্ষেত্র জ্যামিতি ইত্যাদি।

তৎকালে উক্ত পুস্তক সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্য স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এবং উল্লিখিত বিষয় সমুদায়ই বিদ্যালয়ের বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উক্ত পুস্তকগুলির অধিকাংশই বিদ্যালয় হইতে পরিত্যক্ত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে বিবিধ প্রকারের, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকারের পুস্তক সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্বরূপে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা এক্ষণে, গণিতের প্রতিই গ্রন্থকারগণের তীব্র দৃষ্টি পড়িয়াছে। এমন কি সামান্য যোগ

বিয়োগ হইতেই যাদৃশ কাঠিন্য প্রয়োগ করা হইতেছে, সুকুমার-মতি তরুণ বয়স্ক বালকদিগের, তরল মস্তিষ্কে তাহা প্রবেশ করা একান্ত দুরূহ ব্যাপার।

চিন্তাশীল পাঠক! বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বপ্রকাশিত সাহিত্য পুস্তকগুলি আর ব্যবহৃত নাই। নূতন নূতন বহুসংখ্যক সাহিত্য পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তক সকলে ভাষা শিক্ষার যে সমস্ত উপাদান ছিল, (রচনা-প্রণালী দৃষ্টি করুন) বর্ত্তমানকালের সাহিত্য পুস্তকে তাহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। প্রায়ই ব্যাকরণের সঙ্গে দলাদলী, শব্দের সঙ্গে চিরশত্রুতা, ভাব ও ভাষা তথৈবচ। বিষয়গুলি ছাই ভস্ম, মাথা মুণ্ড, কেবল শিয়ালের সিং, বিড়ালের নখ, গরুর লেজ, কুকুরের বীরত্ব, মহিষের জাতীয় সাহানুভূতি, রেল গাড়ীর ফস্ ফস্ শব্দ, মেঘের হুর হুর দুর দুর গর্জ্জন, বৃক্ষের ডাল পাতা, ও কাণ্ড এক অপূর্ব্ব কাণ্ড কারখানা। নাম সাহিত্য, কিন্তু পুস্তকের আদি অন্ত কেবল বিজ্ঞানের আলোচনায় ও কৃষি তত্ত্বে পরিপূর্ণ। যদি এই সকল পুস্তক সাহিত্য বলা যায়, তাহা হইলে মনে হয় যেন "সোণার পিতলের কলসী অথবা কাঁঠালের আমসত্ব"। কিন্তু এই সকল পুস্তক যে সকল লেখকগণের লেখনী-প্রসূত, তাঁহারা সকলেই উচ্চ-শিক্ষিত। কেবল কাল মাহাত্ম্যে সকলি সংঘটিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের প্রকাশিত সাহিত্য পুস্তকের বিষয় ও ভাষা পাঠকগণের দৃষ্টার্থে নিম্নে কথঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল। যথা, শিক্ষক ও ছাত্র কথা বলিতেছেন।

শিক্ষক। প্রিয় সুবোধ! আজ তোমাকে পত্র লেখা শিখাব ইত্যাদি।

শিক্ষক। বলি আবতুল আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?

ছাত্র। আমার মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত কাতর।

শিক্ষক। তোমার পিতাকে এ সংবাদ দিয়াছ? চিকিৎসা করেন কে? ইত্যাদি।

শিক্ষক। ডাকঘরে যে একটী লোক বসিয়া থাকেন, উনি পোষ্ট মাষ্টার, যে ডাকের চিঠি বিলি করে, সে পিয়ন ইত্যাদি।

শিক্ষক। রেলগাড়ীর সম্মুখে যে গাড়ীখানা থাকে, ওখানা ইঞ্জিন, ইঞ্জিন সমুদায় গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। অন্য গাড়ীর মধ্যে যে বেঞ্চ থাকে, উহা আরোহীদের বসিবার জন্য ইত্যাদি।

শিক্ষক। প্রিয় সুবোধ! বিড়ালেরা যে মাটিতে নখ হেঁচ্ড়ে কিজন্য, তাহা জান? তোমাদের নখ বড় হলে, নাপিতের দ্বারা নখ কাট, বিড়াল বেচারারত পয়সা নাই, সে কি করবে? মাটিতে নখ হেঁচড়াইয়া নখ ছোট করে ইত্যাদি।

এরপর গ্যাস, বরফ, বাষ্প, বৃক্ষের লতাপাতা, ফলফুল, কাণ্ড ইত্যাদির আলোচনা। বাহুল্য ভয়ে অধিক উল্লেখ করিলাম না। যে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম, তাহাতেই পাঠকগণ আমাদের কথার সত্যাসত্য বিবেচনা করিতে পারিবেন।

তখন বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে উল্লিখিত বিষয় অর্থাৎ সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা

দেওয়া হইত। কিন্তু এক্ষণে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ড্রিল, ড্রইং এবং কিণ্ডারগার্ডন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে, তৎসম্বন্ধীয় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। কর্ম্ম সঙ্গীত নামক পুস্তকে দেখা যায়, ঘুড়ী উড়ানের, রঙ্গ চেনার, মাছ মারার, ধান কাটার সঙ্গীত সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে যথা :—

"নীল আকাশে ধীর বাতাসে উড়্‌ছে ঘুড়ী কত।
লাল নীল সাদা কাল সবুজ শত শত"—ইত্যাদি
"এইরূপে চাষা ভাইরা ধান কাটেরে।
এইরূপে মাঝি ভাইরা মাছ ধরেরে।"

এই অভিনব প্রণালীর শিক্ষা তখন সমাজে আদৌ প্রচলিত ছিল না।

তখন কেবল ছাত্রবৃত্তি ক্লাশের পাঠ্য পুস্তকগুলি ডিভিসনের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর অফিষ হইতে নির্দ্দিষ্ট হইত। অন্যান্য ক্লাশের পাঠ্য পুস্তক সকল জিলার স্কুল ডিঃ ইন্‌স্পেক্টর এবং স্কুলের শিক্ষকগণ নির্ণয় করিতেন। এক্ষণে সকল ক্লাশের পাঠ্য পুস্তকই সিলেক্‌টেড্‌ কমিটি হইতে নির্ব্বাচিত হয়।

ইংরাজি প্রথম শিক্ষা—অতি প্রাচীন সময়ে দেশে ইংরাজি শিক্ষার জন্য "মার্চ্চ স্পেলিং বুক" নির্দ্দিষ্ট ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত 'স্পেলিং' পুস্তক পাঠ করিয়াই, বালকগণ ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিত। তাহার বহুকাল পরে স্বদেশহিতৈষী বাবু প্যারীচাঁদ সরকার মহোদয় ইংরাজি প্রথম শিক্ষার জন্য অতি সহজ পথ বিস্তার করিলেন। তিনি ইংরাজি প্রথম শিক্ষার জন্য "ফাষ্টবুক অব রিডিং" নামে অতি

সরল ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তকখানি "স্পেলিং বুক" হইতে সরল ও শিক্ষার পক্ষে অতি সহজ হওয়াতে দেশের সর্ব্বসাধারণে এই পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এবং গবর্ণমেণ্টও পুস্তক খণ্ড বিদ্যালয়ের পাঠ্য স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। গ্রন্থকার ক্রমশঃ "সেকেণ্ড বুক, থার্ডবুক, ফোর্থ বুক" এই কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করতঃ দেশে অতুলনীয় প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন। এবং পুস্তক কয়েক খণ্ড অতীব আদরের সহিত বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। তৎপর দেশীয় লোকের ইংরাজি শিক্ষার সুবিধার জন্য ক্রমশঃ নানাবিধ পুস্তক প্রকাশিত হইতে থাকিল।

বোধ হয়, একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহোদয় দেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার জন্য সর্ব্ব প্রথমে অতি সহজ পথ বিস্তার করতঃ যেমন চির অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ, দেশে ইংরাজি শিক্ষার জন্য অতি প্রথমে পরলোকগত বাবু প্যারী-চরণ সরকার মহাশয় অতীব সরল পন্থা প্রদর্শন করিয়া, বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় রহিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গবাসীগণ তাঁহার নিকটে বিশেষরূপে ঋণী।

তৎপর ১২৯৮ সালে বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ মহোদয় ইংরাজি প্রথম শিক্ষার 'উপযোগী' ইংরাজি শিক্ষার সহজ উপায় নামে একখণ্ড পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তক খানি ভাষা শিক্ষার বিশেষ উপযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ে পাঠ্য না হওয়ায় কিছুদিন

পরে উক্ত পুস্তক খানি বিলুপ্ত হইয়া গেল। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি প্রথম শিক্ষার নিমিত্ত"কিং-প্রাইমার"নামে একখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইয়া বিত্থালয় সমূহে ব্যবহার হইতেছে।

দেশীয় সংবাদ পত্রিকা।

আমাদের বর্ণিত সময়ের পূর্ব্বে দেশীয় সংবাদ পত্রের তাদৃশ প্রচলন দৃষ্ট হইত না। কেবল ছুই একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা মাত্র দেশে প্রচারিত ছিল। ক্রমশঃ দেশে উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বহুল সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ হইতে লাগিল।

সাপ্তাহিক পত্রিকা—তখন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রভাকর নামে ১ খণ্ড সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সমাজে প্রকাশিত ছিল। উক্ত পত্রিকার শির-ভাগে লেখা হইত—

কেবলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

সম্পাদক স্বীয় প্রভাকর পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে নানাবিধ সারগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ এবং অতীব রহস্যজনক বহুল সুমধুর প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতেন। (স্থানান্তরে দৃষ্টি করুন) তৎকালে দেশে উক্ত পত্রিকা খানির বিশেষ সম্মান ও সমাদর ছিল। তৎপর, ঢাকা-প্রকাশ, সোম-প্রকাশ, এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হইল। ঢাকা-প্রকাশ, সময় সময় ঢাকা-দর্পণ বলিয়াও প্রচারিত হইত।

বর্ত্তমান সময়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা যেরূপ বৃহদাকার কাগজে ছাপা হয়, তখন এরূপ আকারের কাগজ দেশে দেখা যাইত না। সমুদায় সাপ্তাহিক পত্রিকাই ডিমাই তিনতক্তা কাগজে ছাপা হইত। সে সময়ে সম্পাদকগণের কিছু বেশীরভাগ খাটুনি ছিল। কারণ এক্ষণে যেরূপ পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধেকাংশ বিজ্ঞাপনেই শেষ হয়, তখন এতাদৃশ বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি ছিল না। সম্পাদকগণ পত্রিকার দীর্ঘ কলেবর নানাবিধ সংবাদ ও বহুবিধ প্রবন্ধ দ্বারা পূর্ণ করিতেন। সমুদায় সাপ্তাহিক পত্রিকার বার্ষিক মূল্যই সমেত ডাক মাশুল ৬৲ টাকা এবং সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য ১০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে "সুলভ সমাচার" নামে একতক্তা কাগজ নামক একখানি ক্ষুদ্রাকার সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইত। উহার এক এক খানির এক পয়সা করিয়া মূল্য ধার্য্য ছিল। সুলভ পত্রিকার শিরভাগে লেখা থাকিত—

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়।
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়।
জ্ঞান ধর্ম্ম চাও যদি অবারিত-দ্বার।
দরিদ্র ধনীর তথা সম অধিকার।

ক্রমশঃ বহুবিধ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার হইতে লাগিল। ভারত-সংস্কার, হালিসহর পত্রিকা, রঙ্গপুরদিক-প্রকাশ ইত্যাদি। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকা বহুদিন হইতে প্রচারিত ছিল। এবং অতীব তেজস্বীতার সহিত সম্পাদিত হইত। উক্ত সম্পাদক পত্রি-

কায় সময়ে সময়ে বহুবিধ রহস্যজনক ও সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতেন। ১২৭৬ সালে অতীব কার্য্যকুশল রাজপ্রতিনিধি মহামতি "লর্ড মেও, ভারতের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা রাজধানীতে পদার্পণ করিলেন। এবং রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যয় লাঘব জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি প্রত্যেক বিভাগ হইতে কর্ম্মচারী এবালিস্ করিয়া ব্যয় সংখ্যার হ্রাস করিতে লাগিলেন। ইংরাজি স্কুলের ব্যয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সাহায্য প্রদান করা হয়, তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, এই সাহায্য গবর্ণমেণ্ট হইতে আর দেওয়া হইবে না। স্কুলের সমুদায় ব্যয় দেশীয় লোকেরাই নির্ব্বাহ করিবেন। অচিরাৎ এইকথা দেশে প্রচার হইলে দেশে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। এই প্রস্তাবের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া দেশীয় ছোট বড় সমুদ্রায় লোক ভীত চিত্তে নানাবিধ আন্দোলন করিতে থাকিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ইংরাজি শিক্ষা বন্ধ করিলেন, কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুল উঠাইয়া দিবেন, সমগ্র দেশে এইরূপ ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। তখন অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল যথা :—

"ইংরাজী স্কুল উঠ্‌বে শুনে, নাচে গাধা বালকগণে।
অঙ্ক কষা বড় বোঝা, ঘাস কাটা ঢের সোজা ;
লেখ্‌ব পড়্‌ব মরব্‌ দুঃখে, মাছ ধরিব খাব সুখে,
আবার গ্রাম জেঁকে উঠ্‌লো, দুই একে দুই এল।

লর্ডমেও, দয়ার রাশি, বরের মাসি কন্যার পিসি ;
লর্ডমেও কে আশীর্ব্বাদ, বেঁচে থাক সোণার চাঁদ।

উক্ত পত্রিকায় এইরূপ তীব্র সমালোচনা বাহির হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু সে আইন অধিকদিন স্থায়ী হইল না। কিয়ৎকাল পরেই সে আইন রহিত হইয়া গেল। অমৃতবাজার পত্রিকা, তখন ইংরাজীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া, আনন্দবাজার নামে আর একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা উক্ত প্রেস হইতে প্রকাশ হইতে লাগিল। অমৃতবাজার পত্রিকা বর্ত্তমানেও ইংরাজীতেই প্রকাশ হইতেছে। এবং অনন্দবাজার পত্রিকাও সমভাবে প্রচারিত রহিয়াছে।

ক্রমশঃ "বঙ্গবাসী" "হিতবাদী" "বসুমতী" প্রভৃতি বহুল সাপ্তাহিক পত্রিকা দেশে প্রকাশ হইতে লাগিল। এবং বর্ত্তমান সময়েও নিয়মিত রূপে প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সাপ্তাহিক পত্রিকার মূল্যের হার অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে "সন্ধ্যা" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাহার লেখা অতীব প্রসংশনীয় ছিল।

মাসিক পত্রিকা—ইতি পূর্ব্বে দেশে মাসিক পত্রিকা প্রায়ই দৃষ্ট হইত না। কেবল, বামাবোধিনী নামে একখণ্ড মাসিক পত্রিকা সমাজে প্রকাশিত ছিল। কিন্তু উক্ত পত্রিকা খানিও নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইত না, হয়ত তিন চারি মাস অন্তে এক খণ্ড পাঠকগণের দৃষ্টি পথে উপনীত

হইত। তৎপর ১২৭৯ সালে সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়, 'বঙ্গদর্শন নামে এক খণ্ড মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। বঙ্গদর্শনের অপূর্ব্ব প্রতিভায় সমগ্র বঙ্গভূমি উজ্জ্বলিত হইল। এবং সমুদায় বঙ্গবাসী বঙ্গদর্শন পাঠ জন্য ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখেই পাঠকগণ পত্রিকা প্রাপ্ত মানসে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ডাকঘরে ছুটাছুটি ও কাহার হাতে বঙ্গদর্শন দেখিলে পড়িবার জন্য টানাটানি করিতেন। পত্রিকা প্রকাশের তৃতীয় মাসে দেখা গেল, পত্রিকার ষোল শত গ্রাহক হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রথম বৎসরে বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' নামক একটা অপূর্ব্ব উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সম্পাদক উপন্যাসটির নাম বিষবৃক্ষ প্রদান করিলেও পাঠক-গণ সে বিষবৃক্ষ, অমৃত বৃক্ষের ন্যায় সমাদর করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ মাসে মাসে বিষবৃক্ষের, ডাল পালা, ফুল ফল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সম্পাদকের অমৃতময়ী লেখনী হইতে ক্রমশঃ বিষ-বৃক্ষের 'অনির্ব্বচনীয় মোহিনীশক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং পাঠকগণও প্রফুল্ল হৃদয়ে বিষবৃক্ষ পাঠ করিয়া অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সম্পাদক উত্তরোত্তর বঙ্গ দর্শন পত্রিকায় নানাবিধ সুমধুর প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতে থাকিলেন। তাঁহার লেখনী হইতে যেন পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি উক্ত পত্রিকায় ক্রমশঃ ইংরাজ স্তোত্র, গর্দ্দভ স্তোত্র, যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি নানাবিধ রহস্য-জনক গ্রন্থে সমুদায় প্রকাশ করিতে থাকিলেন।

কিন্তু "গর্দ্দভ স্তোত্র" প্রকাশ হইলে কতিপয় সংবাদ পত্রিকায় তাহার তীব্র সমালোচনা হইলে, তিনি পর মাস হইতে কমলা কান্তের দপ্তর নামে এক প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। সম্পাদক ক্রমশঃ বঙ্গদর্শনে, শৈবালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, ইন্দীরা, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দ-মঠ প্রভৃতি নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া পরিশেষে প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শন বঙ্গদেশে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত থাকিয়া সময়ে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের একবৎসর পর ভ্রমর নামে অতি ক্ষুদ্রাকার আর একখানি মাসিক পত্রিকাও বঙ্গদর্শন প্রেস হইতে কিছু দিনের জন্য বাহির হইয়াছিল। এবং বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয় আর্য্যদর্শন নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকায় বহুল নীতিপূর্ণ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হয়। এবং তিনি সময় সময় বঙ্গদর্শনের প্রকাশিত প্রবন্ধ সকলের তীব্রসমালোচনা করিতেন। ইহার কিঞ্চিৎকাল পরেই শ্রদ্ধেয় বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী 'নব্যভারত' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করি-লেন। সম্পাদক উক্ত পত্রিকায় নানাবিধ সারগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করতঃ স্বীয় সুশিক্ষার ও উদার হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেই সময়ে জিলা রাজসাহী হইতে জ্ঞানাঙ্কুর নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছিল। সম্পাদক 'বঙ্গদর্শনের' কমলাকান্তের দপ্তরের অনুরূপ "মশল্লা বান্ধা পোট্‌লা নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকিলেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর

কমলাকান্তের দপ্তরের নিকটে সে 'মসল্লা বান্ধা পোট্‌লা' আর দাঁড়াইতে পারিল না, পোটলা, পোটলা বান্ধাই থাকিল। মশালের নিকট প্রদীপের আলো ?

ইহার কিছু দিন অতীত হইতেই উচ্চশিক্ষা-সম্পন্ন বাবু কালী-প্রসন্ন ঘোষ বান্ধব পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত পত্রিকায় বহুল প্রবন্ধ প্রকাশ করতঃ স্বীয় অনির্ব্বচনীয চিন্তা শক্তির ও জ্ঞান-বত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া সমাজে অতুলনীয় সুযশ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

তৎসময়ে আর একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। উক্ত পত্রিকা খণ্ডে নানাবিধ সুমধুর প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইত। প্রবন্ধ পাঠে সম্পাদকের অতুলনীয় রচনা শক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। একটি প্রবন্ধে সম্পাদক বহুল গ্রন্থকারের প্রণীত গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তীব্রসমালোচনা হইলেও প্রবন্ধটির লেখাতে বিশেষ মাধুর্য্য ছিল। যথাঃ—

"কল্পনে! এবার তুমি মজিলে এবার।
এবার বঙ্গেতে আর, থাকা তব হলো ভার।
তোমার কুহকে বঙ্গ ভুলিবেনা আর।
এবার তোমার বাছা! কালাপাণি সার।
কি এনেছ ? দেখি দেখি!! ছিছি কর দূর।
ললিত লবঙ্গলতা ? গোস্বামী খুড়োর মাথা ?
দোলে দুলুক লতা তার মলয় সমীরে।
পারিবেনা ভুলাইতে বীর বাঙ্গালীরে।

একি ? পতি বিরহিনী সতী পতির বিরহে।
কান্দিবে যমুনা কুলে নিকুঞ্জ কাননে ;
নাহি আর সেই দিন, সভ্য বঙ্গ সর্ব্বাঙ্গিন।
এবে বিরহিনী ভীমা পতি প্রতিক্ষায়।
সম্মার্জ্জনী করে করি দুয়ার গোড়ায়।
ওকি ? অবকাশরঞ্জিনী ?
বিবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ, নানা ভাবে পরিপূর্ণ,
ভাবেতে বিভোর চিত্ত, ভাবুক জনার।
কোথা মম অবকাশ রঞ্জিব কি ছার ? ইত্যাদি।

অতি দুঃখের বিষয় এতাদৃশ বহুল সুধাময় প্রবন্ধ-পূর্ণ পত্রিকা থানি কিছুদিন প্রকাশিত হইয়া, অল্পকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বর্ত্তমান সময়েও বহুল মাসিকপত্রিকা সমাজে প্রচারিত রহিয়াছে। কিন্তু মাসিকপত্রিকাব আর সে প্রতিভা ও মাধুর্য্য এবং সমাদর নাই। এক্ষণে পত্রিকাগুলি কেবল পাঠকগণের সময় কর্ত্তনের একটী সামগ্রী মাত্র।

পাক্ষিক পত্রিকা—বহুদিন পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মার প্রতিষ্ঠিত আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে "তত্ত্ব-বোধিনী" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত ছিল। তৎপরে বাগ্মী-প্রবর বাবু কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সংস্থাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দির হইতে "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক একখণ্ড পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেশববাবু সাপ্তাহিক উপাসনা কালে যে সমুদায়

মনবিমুগ্ধকর ও সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতা সকল প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত পত্রিকায়, সেই সমুদয় বক্তৃতা প্রকাশিত হওয়াতে, সাধারণে অতি আগ্রহের সহিত পত্রিকা খণ্ড গ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ মপস্বলের প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজেই 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গৃহীত হইত। তৎপর যখন কেশববাবুর সমাজ পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বামকুমার ভট্টাচার্য্য এবং বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠন করিলেন, তখন উক্ত সমাজ হইতে "তত্ত্ব-কৌমুদী" নামে আর একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতৎভিন্ন পণ্ডিত রাজমোহন মজুমদার "ফরিদপুর-হিতৈষী" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থান হইতেও কতিপয় পাক্ষিক পত্রিকা সময় সময় প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন স্থান হইতে পাক্ষিক পত্রিকা, বহির্গত হইতেছে। দৈনিক পত্রিকা—অতি পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত ছিল না। ১২৮১ সালে "প্রভাত-সমীর" নামে একাখনি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই 'প্রভাত-সমীর' প্রভাতীয় মেঘ ডম্বরের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। তৎপর বঙ্গবাসীর দৈনিক, হিতবাদীর দৈনিক প্রভৃতি বহুল দৈনিক পত্রিকা দেশে প্রচারিত হইয়াছে।

সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণের নিগ্রহ—বহুদিন পূর্ব্বে কোন এক সময়ে খিলাটের খান বাহাদুর, কলিকাতা মহানগরী পরিদর্শন জন্য কলিকাতা উপস্থিত হন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বহু সমাদর পূর্ব্বক

তাঁহাকে রাজধানীতে অবস্থান জন্য অতি সুরম্য বাসভবন প্রদান ও যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। তখন দেশীয় সংবাদ পত্রের জনৈক সম্পাদক খান বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ জন্য তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন। সম্পাদককে দেখিবা মাত্র খান বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন "তোম্ কোন্", সম্পাদক বলিলেন "হাম্ খবর-ওয়ালা"। দুর্ভাগ্য বশতঃ খান বাহাদুর খবরওয়ালা না বুঝিয়া কবরওয়ালা বুঝিয়া বসিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া হুকুম দিলেন "এচ্কা শির উতার" দৈবাৎ তাঁহার শরীর রক্ষক অতীব উদার হৃদয় জনৈক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই উপস্থিত ঘোর বিপদ দর্শনে, শঙ্কিত হইয়া খান বাহাদুরকে বুঝাইতে লাগিলেন, "হুজুর একবরওয়ালা নয়, খবরওয়ালা, হুজুরের খোস নাম জাহির করনেকো আয়া," প্রভৃতি ঘটনা অতি বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন খান বাহাদুরের ক্রোধের শান্তি হইল। এবং সম্পাদক মহোদয়ও প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন।

অনেক সময় সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ কোন কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া, কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রভৃতি ভোগ করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর সম্পাদকের অনেক বার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইয়াছে, হিতবাদীর সম্পাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহোদয় জাপান হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমন কালীন, বিশাল সমুদ্রগর্ভে নিরাশ্রয় অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি অনুপম দেশহিতৈষীতার পরিচয় প্রদান করতঃ স্বীয় নাম চিরস্মরণীয়

করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে ঢাকা প্রকাশের সম্পাদকের একটি সংবাদ প্রকাশে অর্থদণ্ড হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক সম্পাদক "যুগান্তর" নামে একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। যুগান্তরের শিরোভাগে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও অসি অঙ্কিত থাকিত। যুগান্তর ভীষণ সিংহনাদে বসুধা বিদীর্ণ করতঃ বঙ্গভূমে দেখা দিল। জলদনাদে গর্জ্জন করতঃ যুগান্তর যেন যুগান্তর কাল উপস্থিত করিতে বসিল। অভ্রভেদীতূর্য্য ধ্বনীতে সমগ্র বঙ্গভূমি বিকম্পিত হইয়া উঠিল। কিয়ং কাল অতীত হইতে না হইতেই যুগান্তর যুগমাহাত্ম্য প্রভাবে গবর্ণমেণ্টের তীব্রদৃষ্টিতে নিপতিত হইল। এবং গবর্ণমেণ্টের কঠিন শাসনে যুগান্তর রসাতলগত ও সম্পাদক নানা রূপ নিগ্রহ ভোগ করতঃ অনতিবিলম্বে মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু যুগান্তর পত্রিকার তেজস্বিনী রচনা সর্ব্বজন প্রশংসনীয় ছিল।

বঙ্গদর্শনের, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর ন্যায়, বঙ্গবাসী পত্রিকার পঞ্চানন্দ ঠাকুর, সময় সময় পাঠকগণের দৃষ্টিপথে উদয় হইয়া নানাবিধ রহস্যজনক লীলাখেলা করতঃ পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতেন। পঞ্চানন্দের অপূর্ব্ব ক্রীড়া দর্শনে, অতীত সময়ের সেই যাত্রা গানের সং দেওয়ার কথা আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হয়। পঞ্চানন্দ সময় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। কখন পঞ্চানন্দ ঠাকুর, মাথায় শোলার টুপি, গায়ে নামাবলী দিয়া, দীর্ঘ যজ্ঞসূত্র ধারণ করতঃ ইংলণ্ডে গমন করিলেন। চীন সাম্রাজ্য আক্রমণ কালীন "পঞ্চানন্দ ঠাকুর" এক মুখ পাঁচ দেহ এবং পাঁচ

দেহে এক মুখ, এক অতি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন সময়ে পঞ্চানন্দ "শঙ্খমণি" ও "ঘাঘড়মণি" সাজিয়া নৃত্য করিতে করিতে "নাচারি" গাইয়া পাঠকগণকে উচ্চ হাস্যে হাঁসাইলেন। যৎকালে মহামতি "রিজলী সাহেব" বৈদ্য কায়স্থের উচ্চতা ও নীচতা নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন পঞ্চানন্দ স্বহস্তে তৌলদণ্ড ধারণ করিয়া উভয় জাতির পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন। এইরূপ পঞ্চানন্দ বঙ্গবাসীর বৃহৎ কলেবরে অবতীর্ণ হইয়া অতি অপূর্ব্ব কাণ্ডকারখানা করিয়া বঙ্গবাসীর মন প্রাণ হরণ করিয়াছেন। এবং সময় সময় সংবাদ পত্রিকার কুষ্ঠি কাটিতেও ত্রুটী করেন নাই। তাই বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক একদা পঞ্চানন্দ ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পঞ্চানন্দ ঠাকুর," বিনয় করিয়া বলিতেছি, অন্যের মাথা খাও হানি নাই, কিন্তু বান্ধবের মাথা খাইয়া অবান্ধবের কার্য্যটা করিও না।" এইরূপ সময় সময় হিতবাদী পত্রিকায় বৃদ্ধ আবির্ভূত হইয়া, বঙ্গবাসীকে "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য" শীর্ষক অতি দীর্ঘ হিতোপদেশ প্রদান করিতেন। আমরা গভীর চিন্তা করতঃ "বঙ্গ-দর্শনের কমলাকান্ত, বঙ্গবাসীর পঞ্চানন্দ, এবং হিতবাদীর বৃদ্ধকে এক আসন প্রদান করাই যুক্তি-যুক্ত মনে করি।